লেখকের অন্যান্য বই

পূর্ণযোগ
দেবজন্ম
ঋষি মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা
চেতনার অবতরণ
আলোর পথে
এ যুগের সাধনা
সাধকের কথা
যৌবনের গান

বোলশেভিকী
ভারতে হিন্দু ও মুসলমান
নীট্‌শের বাণী
স্বরাজের পথে
স্বরাজ-গঠনের ধারা
ভারত-রহস্য
বাঙলার প্রাণ
নারীর কথা
ভাবী-সমাজ

ফরাসী ষোড়শী
মৃতের কথোপকথন

সাহিত্যিকা
রূপ ও রস
আধুনিকী
শিল্পকথা
শিক্ষা ও দীক্ষা
নব্যবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান
কবির্মনীষী

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
কলিকাতা-১২

প্রকাশ ১৩৪৯

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী

বিষয়সূচী

রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

কবি রবীন্দ্রনাথ নয়, মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আজ আমরা একটু দেখিতে চাই। কবির ইহাতে কিছু আপত্তি হইতে পারে—তিনি হয়ত বলিবেন, তাঁহাকে সত্যভাবে দেখিতে হইলে কবি-হিসাবেই দেখিতে হইবে, মানুষ হিসাবে তিনি কি করিয়াছেন বা না করিয়াছেন সেটা তাঁহার জীবনে অবান্তর কথা; তাঁহার যে সত্য যে স্বরূপ, তাঁহার মধ্যে শাশ্বত ও সনাতন যদি কিছু থাকে, তাহা তিনি ধরিয়া দিয়াছেন তাঁহার কাব্যে; বাকি যাহা তাহার কোন বিশেষ অর্থ নাই মর্যাদাও নাই—অন্যান্য অনেকের সহিত সেদিক দিয়া তাঁহার খুব বেশী পার্থক্য বা বিশেষত্ব না থাকিলেও থাকিতে পারে। কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁহার কাব্যে, অন্য পরিচয়ে তাঁহাকে ভুল বুঝা হয়, তাঁহাকে খাটো করা হয়।

কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথ বলিতে আমরা একান্ত বাহিরের বৈষয়িক বা সাংসারিক রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতেছি না, আমরা তাঁহার ভিতরের সেই সত্যকার মানুষটিরই কথা বলিতেছি, যাহার একটা প্রকাশ হইতেছে—কবি রবীন্দ্রনাথ। কাব্যেই হয়ত সেই মানুষটির সর্বশ্রেষ্ঠ অথবা সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট প্রকাশ হইয়াছে, তবুও সেই প্রকাশ যে সত্যকে যে উপলব্ধিকে, অন্তরাত্মার যে সিদ্ধিকে ব্যক্ত করিতে, আকার দিতে চাহিতেছে তাহাই আমাদের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির মূল কথা এবং সকলের চেয়ে বড় কথা

হইতেছে "সৌন্দর্য'—তিনি দেখিতেছেন সুন্দরকে এবং দেখাইতেছেন সেই সুন্দরকে সুন্দরভাবে। যেখানে যাহা কিছু সুন্দর—প্রকৃতির রাজ্যে হউক আর অন্তরের রাজ্যে হউক, কায়ে হউক মনে হউক বাক্যে হউক, তিল তিল করিয়া সকল স্থান হইতে সকল সৌন্দর্য চয়ন করিয়া তিনি কাব্যের গড়িয়াছেন তিলোত্তমা মূর্তি। তাঁহার ভাষা সুন্দর—শব্দেব লালিত্য, ছন্দের লাস্য তাঁহাতে পাইয়াছে বোধ হয় পরাকাষ্ঠা। তাঁহার ভাব সুন্দর—চিন্তার বৈদগ্ধ্য, অনুভবের সৌকুমার্য অতি বিচিত্র ও মনোহর। তাঁহার আখ্যানের বিষয় ও বস্তু নিজে নিজেই সুন্দর; শব্দের অলঙ্কারে, অর্থের অলঙ্কারে—মণ্ডনের উপর মণ্ডন দিয়া—তাহাকে আবার অধিকতর অলঙ্কৃত সুন্দর করিয়া তিনি ধরিয়াছেন। তাঁহার

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামত্তা।
"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"—
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়—
এসেছি, বাসবদত্তা।"

অথবা

তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি' পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা!
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে!

কি একটা অপরূপ অনুপম সৌন্দর্যের কল্পলোকই না উন্মুক্ত করিয়া ধরিতেছে। রবীন্দ্রনাথের ভিতরের আসল মানুষটি হইতেছে এই ঐন্দ্রজালিক রূপকার। সর্বতোভাবে স্বরূপের সৃষ্টি—ইহাই তাঁহার অন্তরপুরুষের ধর্ম, তাঁহার স্বভাবের নিত্যসিদ্ধি। জ্ঞানের দিক দিয়া, শক্তির দিক দিয়া তিনি যত উপরে উঠিয়াছেন, তাহাও ছাড়াইয়া গিয়াছেন তিনি সৌন্দর্যের দিক দিয়া। জ্ঞান বা শক্তি তাঁহার চেতনার মধ্যে নিম্নতর স্থান পাইয়াছে উহারা হইয়া আছে সৌন্দর্যের অনুগত সেবক। রবীন্দ্রনাথের অন্তর-পুরুষটি আসিয়াছে যেন এক গন্ধর্বলোক হইতে। এই গন্ধর্ব পৃথিবীতে অবতীর্ণ পার্থিব-জীবনে প্রকৃত সুন্দরের কিছু প্রকাশ কিছু প্রসার করিয়া দিতে। সৌন্দর্যকে সকল রকমে ব্যক্ত করাই তাঁহার ব্রত ও ধর্ম। সুন্দর কাব্য অনেকে রচনা করিয়াছে—সুন্দরের উপরও অনেকে কাব্য রচিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই কবিশ্রেণীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, তাঁহার অন্তরস্থ কবি-পুরুষ তাঁহার সমস্ত সত্তা ছাইয়া রহিয়াছে। তিনি কাব্য যদি কিছু না-ও লিখিতেন, তবুও তাঁহার জীবনটিই একখানি সুন্দরের জীবন্ত কাব্য হইয়া থাকিত। নিজে তিনি সুদর্শন—তাঁহার বাক্য সুন্দর, তাঁহার ব্যবহার সুন্দর,—তাঁহার কর্ম সুন্দর, তাঁহার ধর্ম সুন্দর।[১] নিজে চারিদিকে সৌন্দর্যকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন—সৌন্দর্য হইতে সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া সৌন্দর্যের অভিমুখে চলিয়াছেন।

---

১ এখানে মনে পড়িতেছে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার রামেন্দ্রসুন্দরকে যে কথায় অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—"তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর—"।

বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের অন্তর-পুরুষ হইতেছে রূপকার। কিন্তু এই রূপ তিনি আকারের সৌষ্ঠব অপেক্ষা বিশেষভাবে ধরিয়াছেন ছন্দের স্পন্দনে। সৌন্দর্যের গঠন অপেক্ষা গতি, বলন অপেক্ষা চলনের উপরেই দেখি তাঁহার কারুকার্যে বেশী জোর পড়িয়াছে। তাঁহার কাব্যসৃষ্টিতে তাই স্থাপত্য বা ভাস্কর্য -রীতির অপেক্ষা বেশী পাই সঙ্গীতের, নৃত্যের রীতির প্রভাব। সুন্দরকে তিনি লাভ করিয়াছেন— স্থিতি নয়, গতির ভিতর দিয়া—দর্শন নয়, শ্রবণের ভিতর দিয়া। যে প্রাণের স্পন্দনে এই সৃষ্টি বিকশিত মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে, বাহ্য আকারের বা কাঠামোর পিছনে যে নিভৃত আবেগ উদ্বেলিত, কবি কান পাতিয়া তাহারই ছন্দ তাহারই সুর শুনিতে ধরিতে চাহিতেছেন। কবি চাহিতেছেন অর্থের অন্তরালে রহিয়াছে যে ব্যঞ্জনা তাহাকে, স্থূল বাক্যের অন্তরে রহিয়াছে যে অশরীরী ভাব তাহাকে। কবি বলিতেছেন—

আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি
শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।

আরও

মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে—

তাই দেখি রূপের আকার যেখানে রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন, সেখানেও

রূপকে স্থির করিয়া, সমাধির বিষয় করিয়া তিনি ধরেন নাই। তিনি দিয়াছেন রূপের চলমূর্তি,—যেমন এই,

ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা—

নৃত্য, ছন্দায়িত গতির মূর্চ্ছনাই দিয়াছে তাঁহার সৌন্দর্যের রূপায়ণ। কালিদাসের কাব্যসুন্দরী সম্বন্ধে আমরা মোটের উপর বলিতে পারি—'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে'; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি দেখি—

শব্দময়ী অপ্সররমণী,
গেল চলি, স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।

তবে রহস্যের কথা এই যে, কবির শব্দময়ী অনুপ্রেরণা স্তব্ধতাকে ভাঙ্গিয়াও বেশী দূর যাইতে পারে নাই। সৌন্দর্যের এই যত নৃত্য, এই যত ঝঙ্কার, ইহাদের বাঁকে বাঁকে কি একটা ভাবের ঘোর, সুরের লয়, এমন মীড় টানিয়া লইয়াছে যে, মনে হয় যেন তাহারা সব ফিরিয়া একটা শান্তির ও স্তব্ধতারই তটে গিয়া মিলিয়া যাইতেছে। কবির মুখরতা যেন মৌনেরই সহিত কোলাকুলি করিয়া আছে। এক দিকে দেখি রসলিপ্সু প্রাণ প্রকৃতির বর্ণে গন্ধে হাস্যে লাস্যে পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্যে মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছে; তাঁহার সৌন্দর্যপিপাসু ইন্দ্রিয়গ্রাম বাহিরের বস্তুসম্ভারের বৈভবের দিকে পরম আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আত্মাকে, ভগবানকেও তাই তিনি ধরিতে চাহিতেছেন যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ-প্রাণের আলিঙ্গনে। তবুও অন্য দিকে এই সকলেরই মধ্যে তাঁহার লক্ষ্য চলিয়া গিয়াছে

অশান্তির অন্তরে যথা শান্তি সুমহান।

স্থূল শব্দের, রূঢ় গতায়াতের, স্থূলস্থূলের জগৎ লইয়া খেলিতে খেলিতেই তিনি ভাবে ও ভঙ্গীতে তাহাকে ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছেন একটা সূক্ষ্মতর লোকে, যেখানে সুর ছন্দ যেন সবে জন্মগ্রহণ করিতেছে—সুর ছন্দ সেখানে কথার রূপের ভারে জড়ের অতিস্পষ্টতা পায় নাই, তাহাতে মাখা আছে একটা শুচিতা, স্বচ্ছতা, লঘুতা, লালিত্য, লাবণ্য—সেখানে

কত যে অশ্রুত বাণী
শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি ,

তাদের নীরব কোলাহলে
অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে—

কবির আকাঙ্ক্ষা তাই হইতেছে—

যে গান কানে যায় না শোনা[১]
সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভা-মাঝে ।

---

১ এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে কীট্‌স্‌-এর

"Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter."

ফলত রবীন্দ্রনাথের মত কীট্‌স্‌ও ছিলেন একান্ত সৌন্দর্যেরই পূজারী, তবে ইংরেজ-কবি সৌন্দর্যকে কান দিয়া শুনা অপেক্ষা চক্ষু দিয়া দেখিয়াছেন বেশী—তাঁহার melodies গতির স্পন্দন অপেক্ষা ফুটাইয়া ধরিতেছে স্থির রূপ , সঙ্গীত বা নাট্য অপেক্ষা তাঁহার কবিত্বে পাই বিশেষভাবে চিত্রের রীতি। গতি, সুর, ছন্দের সূক্ষ্ম সুনিপুণ লাস্য রবীন্দ্রনাথের মত প্রাধান্য পাইয়াছে শেলীর কাব্য-প্রতিভায়।

এ যেন প্রাচীন গ্রীকেরা যাহাকে বলিতেন music of the spheres, সেই জিনিষের মত কিছু, এখানে পাই সৌন্দর্যের আদি আবেগ, মূল ছন্দ। মনে হয়, প্রাণের প্রথম স্পন্দনে সৃষ্টি যখন রূপ গ্রহণ করিতে সুরু করিল—সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—উপনিষদের এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় এবং প্রায়ই তিনি এটি উল্লেখ করিয়া থাকেন—তখনকার সেই প্রথম দোলা, সেই প্রথম তান, সেই নাদ-ব্রহ্মই যেন রবীন্দ্রনাথের ইষ্ট, এবং ইষ্টের সাধনায় অপরূপ সাফল্যই তাঁহার কবিত্বের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা—এই ইষ্টের ধ্যানমূর্তি রবীন্দ্রনাথ দিতেছেন এই মন্ত্রে—

সুর গিয়েছে থেমে, তবু
থামতে যেন চায় না কভু,
নীরবতায় বাজ্‌চে বীণা
বিনা প্রয়োজনে।

২

সত্যের সাধনা আছে, মঙ্গলের সাধনা আছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য ও মঙ্গল সাধনার বস্তু, তাহাদের প্রেমের, সৌন্দর্যের দিক দিয়া। সত্যের সত্যতার জন্য তিনি সত্যের ততখানি উপাসক নহেন, মঙ্গলের মাঙ্গল্যের জন্যও তিনি মঙ্গলের পূজারী নহেন। কিন্তু সত্যকার সত্য আবার সত্যসত্যই সুন্দর, পরম মঙ্গল আবার পরম সুন্দর। সুন্দর বলিয়াই সত্য ও মঙ্গল তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবি, প্রেমের মানুষ—বৈষ্ণব সাধকেরা

যাহাকে বলেন 'সুপুরুষ'। কিন্তু তাঁহার প্রেমও হইতেছে সৌন্দর্যেরই সার। কবির প্রেম তাই কবিকে বলিতেছে—

হাত ধ'রে মোরে তুমি
ল'য়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয়যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা—

প্রেমকে কেবল প্রেম হিসাবে তিনি ততখানি উপভোগ করেন নাই বড়ু চণ্ডীদাস যেমন করিয়াছিলেন, প্রেমের মধ্যে সৌন্দর্য আসিয়া পাইয়াছে চরম অভিব্যক্তি, পরাকাষ্ঠা, তাই তিনি প্রেমিক হইয়া গিয়াছেন। অতি-আধুনিক অনুভূতি প্রেমকে সৌন্দর্য হইতে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট করিয়া ধরিয়াছে, বরং অসুন্দরেরই সহিত তাহার একটা মিলন ঘটাইতে চাহিতেছে, রবীন্দ্রনাথ এই হিসাবে পরম প্রাচীন, সনাতনপন্থী।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য হইতেছে সামঞ্জস্য, সমন্বয়, সুসঙ্গতি, প্রসন্নতা, নির্মলতা, প্রশান্তি। বিরোধ যেখানে, রুক্ষতা রূঢ়তা যেখানে, সেইখানেই সৌন্দর্যের অভাব—সেখানে ছন্দের পতন হইয়াছে, তাল কাটিয়া গিয়াছে, সুর ভাঙ্গিয়াছে, চলনের বলনের দোষ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভগবান তাই হইতেছেন

সুন্দর বল্লভ, কান্ত

এবং

তাঁরি মুখের প্রসন্নতায়
সমস্ত ঘর ভরে।

এই বল্লভের কাছে কবির নিত্যকার আকিঞ্চনও তাই

নির্মল কর উজ্জ্বল কর
সুন্দর কর হে।

এবং

এ জীবনের যা কিছু সুন্দর
সকলি আজ বেজে উঠুক সুরে।

ভগবান ভগবান, কারণ, তিনি নিখিল বিশ্বের মিলনের সূত্র—

সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ—

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রীতি আসিয়াছে এই মিলনের বা মিলের যে সৌন্দর্য তাহার আকর্ষণে। সমস্ত সৃষ্টি 'আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ' বরণীয় লোভনীয়; কারণ তাহার ভিতর দিয়া এক পরম মধুর ঐকতান ঝরিয়া পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথের মহামানবের আদর্শও আসিয়াছে এই ঐকতানের অনুপ্রেরণায়। 'পৃথিবীর সকল দেশ জাতি তাহাদের বিভিন্নতা, বৈশিষ্ট্য লইয়া পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া দাঁড়াইবে —মানবসমাজ এইভাবে পাইবে একটা সুঠাম সৌন্দর্য।' মানুষের মধ্যে সচরাচর সমানে সমানে দেখি যে রেষারেষি, আবার নীচের প্রতি উপরের যে অত্যাচার আর উপরের প্রতি নীচের যে দাসভাব— মানুষের এই ধরণের যাবতীয় হীনবৃত্তিই পরিত্যাজ্য, কারণ, তাহা কর্কশ অসুন্দর কুৎসিত। শান্তি, প্রীতি, ঔদার্য, সৌহার্দ্যই মানুষকে ব্যক্তিহিসাবে ও গোষ্ঠীহিসাবে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতারও মূলে রহিয়াছে এই সৌন্দর্যপ্রিয়তা। দাসত্বের মধ্যে যে শ্রীহীনতা, তাহাই তাঁহাকে বেশী পীড়া দেয়। দারিদ্র্যের স্থূল অভাবটি অপেক্ষা তাঁহার কাছে অধিক অসহ্য দারিদ্র্যের

কুরূপ। মহাত্মা গান্ধীর মত তিনি যদি অভাবকে অভাব হিসাবে একান্ত করিয়া দেখিতে পারিতেন, তবে হয়ত না-হউক একটি বারের জন্য চরকায় হাত দিলেও দিতেন। কিন্তু তাঁহার কাছে স্বচ্ছলতা নিজে নিজেই কিছু সার্থক নয়, স্বচ্ছলতা সার্থক, যদি তা হয় সুছন্দ। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা তাই ভাঙন অপেক্ষা গড়নের উপর বেশী জোর দিয়াছে, বিদেশীর সহিত কলহ-কোলাহল অপেক্ষা নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়া করা, শত্রুকে গিয়া আক্রমণ অপেক্ষা নিজের ঘর সামলান, সারান ও সাজানকেই তিনি আসল কাজ বলিয়া বিবেচনা করেন—গড়ন অর্থ সৃষ্টি করা, তাহার অর্থ সুন্দর করিয়া রচনা করা। জাতির সমবেত জীবনের সকল অঙ্গকে পরিপুষ্ট করিয়া, ঐক্যবদ্ধ করিয়া, তাহাতে রূপগত সৌষ্ঠব ও কর্মগত ছন্দ দেওয়াই হইল তাঁহার স্বদেশী-সমাজের আদর্শ।

তাই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ সুন্দর কাব্য ও সুন্দরের কাব্য যে রচনা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সৃষ্টি হইতেছে, তিনি বাস্তবে, আমাদের জীবনে প্রকৃত সৌন্দর্যের প্রভাব কিছু নামাইয়া আনিয়াছেন, বিশেষত আমাদের বাঙালীর জীবনে, আমাদের বাংলা দেশে। নিজের কাব্যসৃষ্টির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অস্তিত্ব শেষ হইয়া যায় নাই। প্রথমত, তাঁহার অনুপ্রেরণায় তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতি চারুশিল্পের একটা জগৎ, নূতন একটা ধারা, দ্বিতীয়ত, তাঁহার প্রাণের স্পন্দনে আমাদের সারা দেশে একটা সুকুমার রুচি ও অনুভূতি—একটা সৌন্দর্যমুখী চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে, তৃতীয়ত, যে জিনিষটি এক হিসাবে আরও অর্থপূর্ণ,

আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে, আমাদের বসনে ভূষণে, আলাপে ব্যবহারে, গৃহে মজলিসে, বাস্তবের উপকরণে ও প্রয়োগে একটা নূতন সৌষ্ঠব ও পারিপাট্য যদি ক্রমশ দেখা দিয়া থাকে, তবে তাহার মূলে—সাক্ষাতে হউক আর অসাক্ষাতে হউক—রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনেকখানিই রহিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ভারতবাসীর মধ্যে বাঙালীই যা হউক একটু সৌন্দর্যরসিক বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছে। এই খ্যাতি 'ঠাকুর-বাড়ী'র কল্যাণে যে অনেকখানি সম্ভব হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক কালে আমরা কি ছিলাম, জানি না, হয়ত আমাদের সৌন্দর্যবোধ বিশেষভাবে ছিল ভাবের, অন্তরের, বড় জোর শিল্পের জিনিষ, বাহিরের জীবনে পর্যন্ত—জাপানীদের মত—সৌন্দর্যকুশলী জাত আমরা কখনও ছিলাম কি না সন্দেহ। তবুও ভিতরে বা বাহিরে যতটুকু সম্পদ বা সিদ্ধি ঐ বিষয়ে আমাদের ছিল তাহা নানা কারণে একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

প্রাণশক্তির অভাব, বৈরাগ্য, দৈন্য, নৈরাশ্য, তামসিকতা, একটা বিপুল হেলাফেলা, ঘোর বিশৃঙ্খলতা আমাদের জীবনের রূপায়ণকে কুৎসিত করিয়া তুলিয়াছিল। শেষে, যে প্রভাব রবীন্দ্রনাথে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, বিশেষ মূর্তি পাইয়াছে, তাহাই আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিল, খুলিয়া দিল নূতন সৌন্দর্যসৃষ্টির ধারা।

কেবল আমাদের দেশেরই কথা বলি কেন, কেবল বাংলায় বা ভারতবর্ষের মধ্যেই এই প্রভাবকে আবদ্ধ রাখিতে চাই কেন? আমার বিশ্বাস, ইউরোপে—পাশ্চাত্যে—রবীন্দ্রনাথ যে এতখানি আদর পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার কবিত্বের জন্য প্রধানত নয়।

কলকারখানার, যান্ত্রিকতার, রূঢ় প্রয়োজনের শ্রীহীন জীবন হইতে মুক্তি পাইয়া আধুনিক জগৎ রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়া প্রবেশ করিতেছে কোন একটা শান্তির ও শ্রীর নিকেতনে।

প্রবাসী, ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ ও দুঃখবাদ

রবীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী নহেন, জগৎটার মূল সত্য দুঃখ—দুঃখ হইতে তাহার জন্ম, দুঃখের ভিতর দিয়া তাহার লীলা এবং দুঃখেই তাহার অবসান—এই দর্শন বা এই ধরণের দর্শন রবীন্দ্রনাথের নয়। বরং উপনিষদেরই উপলব্ধি ধরিয়া তিনি বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন—আনন্দাদ্ধি খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি।

তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথের জগতে দুঃখের যে-কোন স্থান নাই, তাহা নয়, দুঃখের আছে একটা বিশেষ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনের, গৌরবের আসন—রবীন্দ্র-দর্শনের বৈশিষ্ট্যই ঐ তত্ত্বের মধ্যে। তত্ত্বটি এই—

আনন্দ হইতেছে নিত্যশুদ্ধ সত্য, আনন্দ সৃষ্টির বীজ-সত্য, কিন্তু এই আনন্দেরই একটা নিত্য-রূপ নিত্য-প্রকাশ হইতেছে দুঃখ। দুঃখের সহিত দুঃখের অন্তরে আনন্দ রহিয়াছে ওতপ্রোত। অতি বড় দুঃখ, তীব্রতম বেদনা আনন্দ হইতেই উৎসারিত, আনন্দের একটা ঘনীভূত মূর্তি।

ঔপনিষদিক উপলব্ধিতে, ভারতের গতানুগতিক অধ্যাত্ম-দর্শনে দুঃখের এই স্থান নাই। সেখানে দুঃখ অনিত্য, বিকার। দুঃখ হইল বাধা ও বন্ধন—দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতেই আনন্দের স্ফুরণ। অধ্যাত্ম-চেতনায়, ব্রহ্মভাবে দুঃখ নাই, তাহা কেবল আনন্দময়, সেখানে ছায়া নাই, তাহা কেবল জ্যোতির্ময়; মৃত্যু নাই, কেবল

অমৃতময়। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য যে দেখেন নাই বা অনুভব করেন নাই, তাহা নয়, কিন্তু ইহাকে তিনি চাহেন নাই, ইহাকে অর্ধসত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, বৈরাগ্যের নগ্নতা বলিয়া পরিহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন জাগতিক জীবন, প্রকাশের লীলা—সুতরাং দ্বৈতের বৈচিত্র্য। পৃথিবীর আকাশে তিনি চাহেন ইন্দ্রধনু ফলাইয়া তুলিতে—তাই ত তাঁহার প্রয়োজন মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। এই জন্যই তাঁহাতে এতখানি পাই আলোর সাথে সাথে ছায়ারও পূজা, আনন্দের সাথে সাথে দুঃখের অভিনন্দন, অমৃতের সাথে সাথে মৃত্যুর আবাহন।

প্রাকৃত মন দুঃখকে যে দৃষ্টি দিয়া দেখে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সেই দৃষ্টি নয়। অধ্যাত্মবাদী দুঃখ—পরমার্থতঃ—আদৌ নাই বলিয়া উড়াইয়া দেন। অধিভূতবাদী দেখেন কেবল দুঃখের বাহিরের দিকটা, তাহার ভার, তাহার ক্লেশ, তাহার দীনতা। রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে এই এক দিকের নাস্তিত্ব হইতে বাঁচাইয়া অন্য দিকের আবার একান্ত প্রাকৃত ভাব হইতে মুক্ত মার্জিত উন্নীত করিয়া তাহাকে একটা লোকোত্তর সৌন্দর্যের ও সত্যের আভা পরাইয়া দিয়াছেন।

নিরবচ্ছিন্ন ঐকান্তিক আনন্দ আর যেখানেই থাকুক—অক্ষর ব্রহ্মের মধ্যে হোক কি আর কোন প্রকার স্বর্গে হোক—প্রকাশমান জগতে, দেহ প্রাণ মনের মানুষে, তাহার স্থান নাই। তাই বলিয়া জগৎ বা মানুষ যে আবার নিরবচ্ছিন্ন ঐকান্তিক দুঃখেরই আবাস বা আধার তাহাও নয়। লীলা হইতেছে মিশ্রণ, দুই বিপরীত বস্তুর মিলন। তবে এই মিশ্রণের মিলনের আছে একটা কৌশল, একটা গুপ্ত রহস্য—যে পথে ঐ বিভিন্ন জিনিষ দুটির একটা বিশেষ

সম্বন্ধ ও সংযোগ স্থাপন হয়। আমাদের কবির উপলব্ধিতে তাহা এই—

সৃষ্টি আনন্দময়, সৃষ্টির মূল প্রতিষ্ঠা আনন্দময়, কিন্তু এই আনন্দ প্রকাশ পাইতেছে, উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, নানা ভাবের মধ্য দিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে দুঃখের অভিঘাতে। দুঃখই এক হিসাবে আনন্দকে সচল সক্রিয় শরীরী করিয়া ধরিতেছে। দুঃখ না থাকিলে আনন্দ হয়ত থাকিত, তবে থাকিত সৃষ্টির বাহিরে, অব্যক্তের মধ্যে—কিন্তু ব্যক্তের মধ্যে, মানুষের প্রাণের মধ্যে আনন্দকে গোচর করিয়া ধরিয়াছে দুঃখই। তেমনি অমৃতত্বও মৃত্যুরই মধ্যে জীবন পাইতেছে—দেহের তটে আত্মা আসিয়া যেমন ধরা দিয়াছে, যতিরই কল্যাণে ছন্দের গতি যেমন লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে। এই ভাবেই কবি শুনিতেছেন সীমারই মাঝে অসীমের সুর, বন্ধনের মাঝে তিনি পাইয়াছেন মুক্তির স্বাদ, অরূপের বার্তা রহিয়াছে রূপের মধ্যে—ছায়াহীন 'তুমি'কে কায়া দিতেছে 'আমি'।

দুঃখ নিত্যসত্য—একান্ত দুঃখ হিসাবে নয়—তাহাতে আনন্দই জমাট অতি-তীক্ষ্ণ হইয়া আছে, তাহা বিদীর্ণ করিয়া আনন্দই বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এই দিক দিয়া দুঃখ আনন্দেরই রূপান্তর বা নামান্তর। সেই একই দৃষ্টিতে মৃত্যুও পারমার্থিক সত্য, কারণ মৃত্যু মৃত্যু নয়, তাহা জীবনেরই ভিত্তি, জীবনেরই উৎস—আত্মসংহত আত্মসম্বৃত জীবনেরই নাম মৃত্যু। মিলন-বিরহের সম্বন্ধও অনুরূপ। মিলনের রস, মিলনের তীব্রতা দিতেছে বিরহ। বিরহ যে ছেদ টানিয়া টানিয়া চলিয়াছে মিলন তাহারই মধ্যে নিবিড় গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। বিরহ যদি না থাকিত, মিলনের কোন অর্থই হইত

না। আর সত্যকার মিলন হয়ত ঠিক মিলনেরই মধ্যে নয়—সত্য-সত্যই মিলন হইলে মিলনেরও বোধ হয় শেষ। নিত্যকার বিরহের মধ্যে যে নিগূঢ় টান, যে সান্দ্র অন্তরঙ্গতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাই ত মিলনের অন্তঃসার।

তাই এক ধাপ অগ্রসর হইয়া আমরা আরও বলিতে পারি, বাস্তবিক পাওয়ার মধ্যে বস্তুর সত্যকার পাওয়া নাই। ভগবানকে সাক্ষাৎ চোখে দেখা, আলিঙ্গন করিয়া ধরা—লাভ করা, অর্থ ভগবানকে ফুরাইয়া দেওয়া। ভগবানের অনন্ত অনিশ্চিত নিত্য লীয়মান সত্তাকে কেবল অনুসরণ করিয়া চলাই মানুষের সাধনা। চলা, নিত্য চলাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, গন্তব্যে পৌঁছান নয়, পাওয়া নয়—পাওয়া অর্থ থামা অর্থাৎ শেষ। সিদ্ধি অপেক্ষা সাধনাই বড় সত্য, কারণ সিদ্ধির অর্থ স্থিতি, কিন্তু সাধনা হইতেছে সিদ্ধি হইতে সিদ্ধিতে ক্রমে অগ্রসর হইয়া চলা। ভগবানের দিকে নিত্য অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, নিত্যই তাঁহার নিকট হইতে নিকটতর হইতেছি অথচ তিনি ক্রমেই দূরে দূরে সরিয়া যাইতেছেন—জীবে ভগবানে এই লুকোচুরিই হইল লীলা, সৃষ্টির মূল রহস্য। এবং এই লুকোচুরির, এই লীলার দক্ষিণেতর মুখ (negative pole) হইতেছে দুঃখ, মৃত্যু—বিরহ, বন্ধন।

'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের নয়, তুমি নাই আমি নাই, তুমি-আমির ওপারে আছে শুধু অনির্বচনীয় একং সৎ, কিম্বা সচ্চিদানন্দস্বরূপ শিবের মধ্যে জীব নিঃশেষ লীন লয় হইয়া গিয়াছে, একান্ত জ্ঞানীর এই উপলব্ধিও রবীন্দ্রনাথের নয়। তাঁহার অনুভব, তাঁহার সিদ্ধান্ত ভক্তের, প্রেমিকের, উন্মুখী মর্ত্য-মানুষের।

রবীন্দ্রনাথ জগৎকে জীবনকে লীলাকে সমর্থন করিতেছেন সর্বাঙ্গোপাঙ্গে, কায়মনোবাক্যে; কিন্তু জ্ঞানীরা, তত্ত্ববেত্তারা বলিতে পারেন এই মায়াকে সমর্থন করিতে গিয়া, মায়ার অন্তর্গত যে সকল নামরূপ বস্তুত হইতেছে বিকৃতি—যাহাকে বলা হয় মায়ার বিদ্যারূপ নয়, কিন্তু অবিদ্যারূপ—তাহাদিগকে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করিয়াছেন, বরণ করিয়া লইয়াছেন।

অবিদ্যা-শক্তির নিত্যত্ব, পারমার্থিক অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছেন। অবিদ্যাকে বিদ্যার সহিত, অপরা প্রকৃতিকে ব্রহ্মের সহিত, দুঃখকে আনন্দের সহিত, মৃত্যুকে অমৃতত্বের সহিত সমান স্তরে তিনি স্থাপন করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-সাধকেরা বলিবেন রবীন্দ্রনাথের এই অনুভব মানসিক ক্ষেত্রের অথবা কল্পনাগত চেতনার—মনের উপরে অধ্যাত্মের বা পরমার্থের স্তরে উঠিলে, এই অনুভব আর পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তুলনা করিয়া অনেক সুধী এমনও কহিতে পারেন, উক্ত তত্ত্বটি আধুনিক মনোভাবের একটি বিশেষ প্রকাশ এবং ইহার উৎপত্তিস্থল হইতেছে ইউরোপ। আত্মা ও অনাত্মার অথবা বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধ লইয়া একটা মত জার্মান পণ্ডিতেরা খুব চলিত করিয়া দিয়াছেন—অনাত্মা আছে বলিয়াই আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব হইতেছে, বিষয়ী আপনাকে জানিতেছে, অনুভব করিতেছে বিষয়ের সম্পর্কে সংঘাতে আসিয়া। এই দার্শনিক তত্ত্বটিকে খৃষ্টীয় ভক্তিরসে সিঞ্চিত করিয়া, রক্তমাংস পরাইয়া, তৎসহায়ে কবি গ্যেটে ভগবান ও শয়তানের সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়াছেন। করুণাময় ভগবানের রাজ্যে শয়তানের আবির্ভাব কেন হইল? শয়তান হইতেছে ভগবানের হাতে অঙ্কুশ,

মানুষ যখন ঘুমাইতে ঝিমাইতে থাকে, তখন তাহাকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য ভগবানের ঐ অস্ত্র, এই কথাটির একটা প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাই এইভাবে—

যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই তো পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে
চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন ক'রে
আমার যত কালো॥

সে যাহা হোক, ভারতের অধ্যাত্ম-দর্শন দুঃখ ও আনন্দ, কি অবিদ্যা ও বিদ্যার, অথবা মৃত্যু ও অমৃতত্বের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিতেছে অন্য ধরণের কথা। তাহার সিদ্ধান্ত অনুসারে অধ্যাত্ম-চেতনায় ঐ যুগ্মের, ঐ দ্বৈতের যুগপৎ স্থান নাই। ঐ যুগলের এক-একটি হইতেছে পৃথক পৃথক লোকের বা চেতনার বস্তু—একটি হইতেছে উপরের আর একটি নিম্নের, একটি পরা প্রকৃতির আর-একটি অপরা প্রকৃতির। ঊর্ধ্বতম চেতনায়, অধ্যাত্মলোকে, ভগবৎ-সান্নিধ্যে উহাদের একটিই আছে অন্যটি নাই, থাকিতে পারে না। বিদ্যাকে, আনন্দকে, অমৃতকে পাইতে হইলে অবিদ্যাকে, দুঃখকে, মৃত্যুকে সর্বদা ও সর্বথা বর্জন করিয়া আসিতে হইবে।

আমরা বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথ এক শ্রেণীর অধ্যাত্মবাদীর—বৈরাগ্য-

তন্ত্রীর—বিরুদ্ধে ঐহিকের, পৃথিবীর, জীবনের আপনকার সত্য, নিত্য-সত্য, পারমার্থিকতা স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সেজন্য ঐহিকেব সকল নাম, সকল রূপ, সকল গতিই যে পরম সত্য হওয়া প্রয়োজন তাহা না'ও হইতে পারে। ঐহিকের সত্য আছে, সার্থকতা আছে—কিন্তু তাহা যাবতীয় ব্যক্ত প্রাকৃত নামরূপের মধ্যে হয়ত নয়—নেদং যদিদমুপাসতে। দুঃখ বা মৃত্যু বা জরা বা ব্যাধি পার্থিব-জীবনের অনুষঙ্গী যতই হৌক, ইহাদের অভাবে যে পার্থিব-জীবন থাকিতে পারে না, পার্থিব-জীবনের গভীরতম সত্যতম প্রকাশের সহিত ইহাদের যে অচ্ছেদ্য অনিবার্য সম্বন্ধ, এমন বাধ্যবাধকতা নাই। বরং আসল সত্য এই ধরণেরও হইতে পারে যে, জীবন, জাগতিক লীলা, কেবল আনন্দের অমৃতত্বের, সৌন্দর্যের চিব-যৌবনেব বিগ্রহ না হইয়া যদি অন্য রকম হইয়া থাকে তবে তাহার অর্থ জীবনে, মানুষের আধারে অশুদ্ধির জন্য, উহারা বিকৃত হইযা দুঃখ, মৃত্যু, শ্রীহীনতা, জরা -রূপে দেখা দিয়াছে। এই অশুদ্ধির জন্যই আমাদের আশঙ্কা হয় দ্বৈতকে নষ্ট করিতে গেলে লীলার বৈচিত্র্য তীব্রতা বুঝি লোপ পাইবে।

গভীরতব জ্ঞানের সিদ্ধান্ত কি হইতে পারে এবং রবীন্দ্রনাথের অনুভবের পশ্চাতে কি তত্ত্ব রহিয়াছে—এই দুই-এর পার্থক্য আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কবির কবিত্বের কথা তাহাতে কিছু উঠে নাই। কবির লক্ষ্য সার্বাঙ্গিক সত্য, অখণ্ড জ্ঞান কিছু নয়, তাঁহার কাজ তাঁহার অনুভবকে উপলব্ধিকে—তাহা যে জগতে হৌক—যতদূর সম্ভব তীব্র করিয়া জাগ্রত করিয়া দেখান—এবং এই একতানতার জন্য যদি সেই অনুভব উপলব্ধিতে বাস্তবতার দিক

মিয়া সত্যাভাস, এমন কি অসম্ভব কিছু আসিয়া মিশিয়াছে দেখা যায় তাহাতে কবিত্ব হিসাবে ক্ষতি হয় না, বরং হয়ত উৎকর্ষই হয়—কবির কবিত্বশক্তির যাদুতে দোষই গুণ হইয়া দাঁড়ায়।

তা ছাড়া জ্ঞান হিসাবেও রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি চরম আধ্যাত্মিকতার শিখরে যদি না-ই পৌছিয়া থাকে, তবুও মানুষের সাধনায় স্থান বা সার্থকতা তাহার কিছু কম হইবে এমন নয়। একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিব রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ ইষ্ট হইতেছে 'সম ব্রহ্ম' —যে অনির্বচনীয় সত্য রহিয়াছে সর্বত্র সমানভাবে—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম —সুখে দুঃখে, পাপে পুণ্যে, জীবনে মৃত্যুতে, স্বর্গে মর্তে, এ-লোকে ঐ-লোকে এবং যাহার সৌন্দর্যের আভায় অতি কুৎসিতও সুন্দর হইয়া দেখা দেয়—যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

এই সম ব্রহ্মের পরে হয়ত আছে সক্রিয় ব্রহ্ম। তাহার সত্য, তাহার রহস্য অন্য প্রকারের; কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠা এই সম ব্রহ্ম।

গোড়ায় প্রাকৃত জনের একান্ত রূঢ় দুঃখবোধ; অন্তিমে নিরাবিল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। মাঝখানে হইতেছে আনন্দীভূত দুঃখ—দুঃখ যেখানে পরিবর্তিত রূপান্তরিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ সেই অন্তর্বর্তী জগতের স্রষ্টা। তিনি বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া কি প্রকারে অমৃতত্ব লাভ করিতে হয় সেই রহস্য আমাদিগকে হয়ত দিয়া যান নাই, তিনি দিয়াছেন অবিদ্যাকে ধরিয়া কি প্রকারে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হয় সেই রহস্য।

বিচিত্রা, ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা

প্রথম পর্যায়

রবীন্দ্রনাথে বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে। এক কথায় যদি বলিতে হয় তবে বলিব, ইহাই রবীন্দ্রনাথের দান এবং এই সূত্রটির মধ্যে কবির সৃষ্টির স্বরূপও সম্যক্ আমরা ধরিতে পারিব। বলা বাহুল্য, আধুনিকতার অবতরণিকা রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই সুরু হইয়াছে; কিন্তু তাহার যে প্রবাহ, যে বন্যা বাঙালীর মন প্রাণকে চারিদিক হইতে ডুবাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথ হইতে। আধুনিকতার আরম্ভের দুইজন প্রধান শিল্পীকে আমরা স্মরণ করিতে পারি—মধুসূদন ও বঙ্কিম। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টির মধ্যে তবুও আছে একটা অতীতের রেশ, তাঁহাদের ভাবে ভঙ্গীতে কোথাও রহিয়া গিয়াছে একটা গতকালের, পুরাতনের আভাস। ঈশ্বরগুপ্ত-দীনবন্ধু হইতে বঙ্কিম-মধুসূদনে—কাল হিসাবে নয়, কিন্তু ধর্ম হিসাবে—যে ব্যবধান, তাহা একটা বিপর্যয়ই। এইটুকু অবকাশে বাঙালীর মতিগতির রসবোধের মুখ সম্পূর্ণ ঘুরিয়া গিয়াছে। আধুনিকতার পাকা সড়কে বঙ্কিম-মধুই বাঙলাকে তুলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। তবুও, সে পথে উঠিয়াও প্রাচীন যুগের ধরণ-ধারণ—কেমন যেন মাঠ-ঘাটের গন্ধ, কাদামাটির স্পর্শ—আমরা একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে আমরা সেখানে গাড়ী-ঘুড়ী—গাড়ী-ঘুড়ী কেন, রেল-মোটর পর্যন্ত চালাইয়া দিয়াছি।

আধুনিক অর্থে বর্তমান বটে—কিন্তু জিনিষটি কেবল কালগত নয়, উহার মধ্যে আছে আবার একটা দেশগত গুণ। আধুনিক আধুনিক হইয়াছে বিশ্বজগতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংমিশ্রণের কল্যাণে। জাতিতে-জাতিতে দেশে-দেশে নিবিড়তর আদান-প্রদান প্রত্যেক জাতিকে দেশকে দিয়াছে একটা অভিনব রূপ, অভিনব ধর্ম— এইভাবে যে অভিনবত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই বোধ হয় আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যের প্রধান অঙ্গ। মধুসূদন-বঙ্কিম যে আধুনিক, তাহার অর্থ এই—তাঁহারা বাঙালীর শিল্পচেতনায় ইউরোপীয় হাবভাব আনিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। ইউরোপই হইল আধুনিক যুগের ধর্মক্ষেত্র, পীঠ-স্থান। বর্তমান যুগে মানবজাতির যে মুখ্য লীলাধারা, তাহা ইউরোপের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। সুতরাং ইউরোপের সংস্পর্শে আসা অর্থই আধুনিক হইয়া উঠা—পৃথিবীর রঙ্গক্ষেত্রে সম্মুখের আসন গ্রহণ করা। এসিয়ায় জাপান এইভাবেই আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে —আর ইহার অভাবে চীন তাহা পারে নাই। আমরা ভবিষ্য যুগের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি গতকল্যের ও বর্তমানের কথা। ভারতের মধ্যে বাঙালীই সকলের আগে ও সকলের অপেক্ষা বেশী ইউরোপীয় হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই না আজ তাহার কৃতিত্ব অন্যান্যের সাফল্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে? ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু পর্যন্তও বাঙালীর চিত্ত একান্ত বা মুখ্যত ছিল বাঙালী-ই, তাহার কল্পনা, তাহার অনুভব, তাহার চেতনা তাহার সঙ্কীর্ণতর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বঙ্কিম-মধুসূদন সেই বৈশিষ্ট্যের, সেই সঙ্কীর্ণতার, সেই বাঙালীত্বের প্রাদেশিকতার দেউল ভাঙিয়া দিলেন—তাহার মধ্যে আনিয়া মিশাইলেন দেশান্তরের কল্পনা, চেতনা, রীতিনীতি।

রবীন্দ্রনাথও এই কাজই করিয়াছেন, কিন্তু আরও সূক্ষ্মতর, আরও গভীরতর, আরও ব্যাপিকতর ভাবে। প্রথমত, আধুনিকতার প্রথম যুগে দেশীয় ও বিদেশীয় ধারা দুইটি একসঙ্গে হইলেও সম্পূর্ণ মিলিয়া-মিশিয়া যাইতে পারে নাই—পাশাপাশি তাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে ছিল একটা ছেদ, একটা বৈসাদৃশ্য ও দ্বন্দ্ব—তেল-জলের মত। মধুসূদনে এই দুই সুর স্পষ্ট পৃথক রাজিয়া চলিয়াছে—বঙ্কিমেই প্রথম সত্যকার সমন্বয় ঘটিতে সুরু করিয়াছে। তবুও সে যুগের শিল্পরচনা মোটেব উপরে দেখিলে মনে হয় যেন দেখিতেছি নীচের অর্ধে গিলে-কোঁচান, এলায়িত ধুতির লাস্য, আর উপরের অর্ধে কোট, ওয়েস্ট-কোট, নেকটাইব কডা বন্ধন। নিজের নিজের দিক হইতে দুই-ই সুন্দর, সুষ্ঠু—কিন্তু উভযের সংযোগে সমন্বয় নাই, ঐকতান নাই। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য—এই ঐকতান তিনি পূর্ণরূপে দিয়াছেন। বাঙালীর রসসৃষ্টিতে বাহিরের মুক্ত হাওয়া খেলাইয়া প্রাদেশিকতাকে তিনি দূর করিয়াছেন, অথচ তাহা বৈদেশিকতার কোলে গিয়া পডে নাই, কৃত্রিম পরানুকরণ বা প্রতিধ্বনিমাত্র হইয়া উঠে নাই—তাহা হইয়াছে সার্বদেশিক। সর্বতোভাবে বাঙালীরই জিনিষ তাহা, অথচ আবার মানব-সাধারণের আপনার হইয়া গিয়াছে। বিশ্বভূপর্যটন করিয়া সে চেতনা ঘরে ফিরিয়াছে, গভীরতর বৃহত্তর ভাবে ঘরের জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে। তাই ত কবি বলিতেছেন—

দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া!—

এই যেমন সুইনবার্ণ বা মেটেরলিঙ্কে যে ভাবভঙ্গী মতিগতি রূপ

পাইয়াছে; তার এক-একটা তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথে কোথাও ধরা দিয়াছে বলা যাইতে পারে। তবে পাশ্চাত্ত্যের যাহা নিজস্ব বিশিষ্ট জিনিষ, রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার আগুনে গলিয়া গিয়া, তাহা রবীন্দ্রনাথেরই —বাঙালীর নিজস্ব সত্তার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে—হইয়া উঠিয়াছে তাহার চিরকালের সম্পদ। দেশ হিসাবে, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি এইরকমে তির্যক্‌ভাবে প্রসারিত হইয়াছে, আলিঙ্গন করিয়াছে বিশ্বকে। কাল হিসাবেও তাহা আবার অন্য দিকে বর্তমান হইতে উঠিয়া গিয়াছে অতীতে। বৈষ্ণব-সাধকের অনুভব, উপনিষদের অনুভবের রাজ্যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন—এই দিককার অনুভবকে লইয়া নামিয়া আসিয়াছেন আবার সেই তির্যক্‌-প্রসারিত বিশ্ব-অনুভূতির মধ্যে। এই দুই-এর মিলনকে সংযুক্ত করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কাব্য-জগতের আধুনিকত্ব, যাহার প্রধান কথা হইল প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্ত্যের, অতীতের ও বর্তমানের একটা সামঞ্জস্য ও সমীকরণ। এইভাবে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্ত্যের, অতীতের ও বর্তমানের বিশিষ্ট অনুভূতি-উপলব্ধি, ভাব-চিন্তা কবির নিবিড় রস-বৈদগ্ধ্যের মধ্যে মিলিয়া-মিশিয়া একটা সমৃদ্ধতর সৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছে—সেখানে একপ্রাণতা একতানতা লইয়া একটি বৃহৎ বৈচিত্র্য তাহার অনবদ্য সৌন্দর্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি পাশ্চাত্ত্যের ও আর-একটি ভারতের নিজস্ব ধারা, অথবা একটি অতীতের ও আর-একটি বর্তমানের ধারা কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সুন্দর গবেষণার বিষয়। আমার লক্ষ্য তাহা নয়, বিষয়টির দুই-একটি প্রধান সূত্র শুধু ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিব। ইউরোপীয় চেতনার, বিশেষত আধুনিক ইউরোপীয়

চেতনার, মূল উপলব্ধি হইতেছে এই স্থূল জগতের, এই জাগ্রত পঞ্চেন্দ্রিয়গত আয়তনের, এই যৎকিঞ্চজ্জাত্যাং জগতের একান্ত সত্যতা, অনিবার্যতা, জীবন-মৃত্যুর; জীবন হইতে হয়ত বেশী মৃত্যুর, সুখ-দুঃখের, সুখ হইতে বেশী দুঃখের, আলো-ছায়ার, আলো হইতে বেশী ছায়ার, দ্বৈতের, দ্বন্দ্বের, মানবতার সৌন্দর্য ও সার্থকতা। এই ভাবের ভাবুক হইয়াই আমাদের কবি বলিয়াছেন—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়—

অথবা

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?—

কিম্বা

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো !
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো !

ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতির প্রপঞ্চের পূজা আমাদের দেশে যে কিছু কম তাহা বলি না। কালিদাসে জয়দেবে ইন্দ্রিয়ালুতার যে ঐশ্বর্য পুঞ্জীভূত, তাহার তুলনা জগতের অন্যান্য সাহিত্যে খুব অল্পই মিলে। তবুও পার্থক্য একটা আছে। যে চেতনা, যে মনোভাব লইয়া ইউরোপ ইন্দ্রিয়গত জগৎকে বরণ করিয়াছে, আলিঙ্গন দিয়াছে, তাহা হইল Profane, Pagan—লৌকিক, বৈষয়িক, স্থূলকে একান্ত স্থূলভাবে ধরিয়া ছুঁইয়া যে আনন্দ যে অন্তরঙ্গতা আমরা অনুভব করি, শরীর শরীরকে জড়াইয়া যে সরসতায়, যে মার্দবে, যে কারুণ্যে ভিজিয়া উঠে। ইউরোপের কবি ভার্জিলের কথায়, সব মর-বস্তুরই অন্তরে অন্তরে জমিয়াছে যে অশ্রুর উৎস—sunt lacrymæ rerum—

তাঁহারই অনুপ্রেরণায় চলিয়াছে ইউরোপের শিল্পীচিত্ত। ভারতীয় চেতনা পার্থিবকে ধরিয়াও একান্ত পার্থিব সম্বন্ধেরই মধ্যে সকল পরিচয় নিঃশেষ করিতে পারে নাই। উপনিষদে যেমন বলিয়াছে, পতি প্রিয় যদি হয়, পত্নী বা পুত্র প্রিয় যদি হয়, তবে তাহা পতি হিসাবে, পত্নী হিসাবে বা পুত্র হিসাবে নয়—কিন্তু আত্মার হিসাবে, জগতে যাহা কিছু প্রিয় তাহা প্রিয় তাহার নিজের জন্য নয়, কিন্তু আত্মার জন্য, 'আনন্দে'র জন্য। চেতনার এই যে আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠা তাহা ভারতের সকল মানুষ বা সকল শিল্পীর মধ্যে যে সজ্ঞানে প্রস্ফুট ও সক্রিয় তাহা নয়। কিন্তু ভারতের আকাশে বাতাসে, জলে মাটিতে এই ভাব ছড়াইয়া ওতপ্রোত হইয়া আছে, তাই তাহার এই ভাব স্রোতের উপর সকলের চেতনায়—শিল্পীদের শিল্পরীতিতে আনিয়া দিয়াছে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী, একটা নিজস্ব সুর। বৈষ্ণব কবিদের রচনায় পার্থিব রসের প্রাচুর্য, আতিশয্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সেই রসকে অনেক স্থলে কেবল নামমাত্র ভগবানের সহিত জুড়িয়া যে দেওয়া হইয়াছে, শুধু সেই জন্যই সেখানে কি দেখা দেয় নাই একটা বৈশিষ্ট্য—যাহাকে ঠিক পরিচিত ঐহিকতার মানবতার পর্যায়ে ফেলিতে পারি না? আর কিছু না হোক পৃথিবীর বস্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয়, সেখানে তাহাদের নিজস্ব মূল্য আপনারই সত্য লইয়া ফুটিয়া উঠে নাই—তাহাদের মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে, ভিন্ন একটা জিনিষের মূল্যের তুলনায়, তাহাদের সত্য যাচাই হইয়াছে অন্য-কিছু সত্যের প্রতীক অবলম্বনে বা প্রতিবন্ধক হিসাবে। অবশ্য ইউরোপেও এমন কবি-শিল্পী যে না আছে তা নয়, যিনি মরের পশ্চাতে অমরের অনুভূতি, জড়ের উপর চৈতন্যের উপলব্ধি পাইয়াছেন,

যিনি নিভৃততর অনুভূতি উপলব্ধিটিকেই এত বড় করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহার বাহন নামরূপ, পার্থিব আকার প্রায় গৌণ—ছায়া প্রতিবিম্ব মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের দৃষ্টিতে প্রকৃতির সকল সত্য, সকল সৌন্দর্য নিহিত প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী যে শক্তি—যাহার নাম দিয়াছেন তিনি Spirit—একান্ত তাহারই মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়কে বিষয় ভাবেই, দেহকে দেহ দিয়াই ধরিতে ছুঁইতে চাহিয়াছেন। অধ্যাত্মদ্রষ্টার মত বিষয়কে কেবল আত্মার সহায়ে, শরীরকে অশরীরীর সহায়ে আলিঙ্গন করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। মর-জীব হিসাবে তিনি মর-বস্তুর রস গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন। অথচ এই মরত্বেরই মধ্যে আবার অমরত্বকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেহকে দেহভাবে ধরিয়াই তাহার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন আত্মিক অদেহী একটা কিছু। এই দ্বৈতের, বৈপরীত্যের সমন্বয় তাঁহার উপলব্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য। পার্থিব রুচিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাহাকে আরও তীক্ষ্ণ তীব্র করিয়া ধরিয়াছেন—Pagan-এর লোকায়তদেরই মত; অথচ তাহার মধ্যে অপার্থিবের ধারা একটা নামাইয়া আনিয়াছেন। অপার্থিব বস্তুটির জন্য তিনি চলিয়া গিয়াছেন তাঁহার দেশের নিজস্ব সুপ্রাচীন ঔপনিষদিক চেতনার দ্বারে। এই অপার্থিব ও পার্থিবের মধ্যে, আত্মার ও দেহের মধ্যে একান্ত অন্তরের ও একান্ত বাহিরের মধ্যে যে সেতু সংযোগসাধন করিয়াছে তাহা হইল বৈষ্ণবের, ভক্তের, প্রেমিকের, রসিকের হৃদয়ালুতা।

ঔপনিষদিক যে এক অদ্বিতীয়, অনন্ত আনন্দ ব্রহ্ম—যে বৃহৎ যে ভূমা, সকল সীমাকে সকল খণ্ডকে ছাড়াইয়া গিয়া বা ঘিরিয়া ধরিয়া

আছে, যাহা অসীম অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে প্রধানত উপলব্ধি করিয়াছেন প্রাণরূপে। এই প্রাণের জয়, প্রাণের মাহাত্ম্যই তিনি প্রতিপদে গাহিয়া চলিয়াছেন—উপনিষদের এই মহাবাক্য বার বার উল্লেখ করিয়াছেন—

সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—

নিজেও ঐ ভাবের ভাবুক হইয়া বলিতেছেন—

ডুব দিয়ে এই প্রাণ-সাগরে
নিতেছি প্রাণ বক্ষ ভ'রে।

এই প্রাণের লাস্যই তাঁহার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে সচলতার, গতির প্রাধান্য। আধুনিক চিত্তবৃত্তির আর-একটা বৈশিষ্ট্য এই দিক দিয়া আবার তাঁহাতে দেখা দিয়াছে। কিন্তু আধুনিক প্রাণবাদীদের সাথে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এইখানে যে গতিকে সচলতাকে বড় করিলেও তাহাকে একান্ত করিয়া তিনি ধরেন নাই। তাহার মধ্যে বা পিছনে একটা স্থিতির আভাস তিনি রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছেন পরিশেষে একটা মহাশান্তির মধ্যে। দ্বন্দ্বের বহুর বাহিরের উচ্ছল উদ্বেল ধারায় নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াও একটা দৃষ্টি একটা অনুভব তিনি রাখিয়াছেন ভিতরের অন্তঃপুরের দিকে, যেখানে সব শান্ত স্তব্ধ স্তিমিত—একং। তিনি বলিতেছেন বটে—

রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক্ ধূলাবালি,—

কারণ, তাঁহার আসল পুরাপুরি কথা হইতেছে এই—

বাইরে তখন যাস্ রে ছুটে,
থাকবি শুচি ধুলায় লুটে;
সকল বাঁধন অঙ্গে নিয়ে
বেড়াবি স্বাধীন,—
অন্তরেরি অন্তঃপুরে
থাক্ রে ততদিন।

রবীন্দ্রনাথ যে প্রাণের পূজা করিতেন তাহা হইতেছে প্রাণব্রহ্ম—এই প্রাণব্রহ্মই তাঁহার চেতনায় জগৎকে যেমন জগৎ করিয়া রাখিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি তাহাতে সজীব সজাগ করিয়া ধরিয়াছে জগদাতীতের একটা ইঙ্গিত আভাস।

রবীন্দ্রনাথের এই দিকটির উপর আমরা এতখানি জোর দিতেছি এইজন্য যে, আধুনিকতার—অথবা অব্যবহিত ভবিষ্যতার—একটি, একটি কেন, হয়ত মূল রহস্যই, এইখানে। বাস্তবের বাস্তবতা না হারাইয়া তাহার মধ্যে অবাস্তবকে পাওয়া ও প্রতিষ্ঠা করা—বাস্তবকে অবাস্তবের শরীর করিয়া ধরা, অবাস্তবকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা। অবাস্তবের অঞ্জন পরিয়া বাস্তবকে একেবারে ভুলিয়া না গেলেও, বাস্তবের নিজস্ব রূপকে ভাবকে চাপা দিয়া, তাহার উপর অবাস্তবের আলেপ মাখাইয়া বাস্তবকে আমরা নূতন করিয়া অবাস্তব করিয়াই দেখি—প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার এই ছিল ধারা। কিন্তু আধুনিক চাহিতেছে বাস্তবের স্বরূপ-স্বভাবকে জাগ্রত রাখিয়া, তাহার বৈশিষ্ট্যকে অটুট রাখিয়া তাহাতে অবাস্তবকে মূর্ত ও বাস্তব করিয়া ধরিতে। কবির

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি—

দিয়াছে এই প্রয়াসের এই প্রেরণার মন্ত্র।

মানবজাতির সমস্ত ভবিষ্যৎ এই সাধনার উপর, এই সাধনার গভীরতর সিদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে—আমাদের বিশ্বাস। এবং এই হিসাবে কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে ঋষি রবীন্দ্রনাথ হইয়া উঠিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার একজন অগ্রণী, দিশারী—আধুনিক জীবনসাধনার যে মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তাহা তাঁহাতে বাণী পাইয়াছে, মন্ত্ররূপ ধরিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য ছাড়া আধুনিক চেতনার গড়ন, ভাবটি ছাড়া তাহার ভঙ্গী, রবীন্দ্রনাথে কেমন প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাও এক দেখিবার জিনিষ।

বাংলায় মধুসূদন যেদিন পয়ারের সমতা ভাঙিয়া অমিত্রাক্ষরের বিষমতা সৃষ্টি করিলেন, সেদিন একটা যুগপরিবর্তন ঘটিল। ইউরোপেও ভিক্টর হিউগো যেদিন আলেক্সাঁদ্র্যা নামক ক্লাসিকাল ছন্দের কঠোর বাঁধনছাদন বিধিনিষেধ কাটিয়া একটা মুক্ততর লঘুতব গতি দিলেন সেদিনও একটা অনুরূপ যুগান্তর আসিয়াছিল। এই যুগান্তরেরই নাম আমি দিতে চাই আধুনিকতা। আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ, বিশিষ্ট ভঙ্গী আমি নির্দেশ করিব কাব্য-রচনার একটি প্রক্রিয়াকে ধরিয়া—সে প্রক্রিয়াটি হইতেছে ফরাসীরা যাহাকে বলে enjambement, আমাদের আলঙ্কারিকেরা কাব্যের দোষ দেখাইতে গিয়া যাহার নাম দিয়াছেন 'অর্থান্তবৈকবাচকত্ব', অর্থাৎ এক পংক্তির বা পদের জের আর-এক পংক্তিতে বা পদে টানিয়া লওয়া, আধুনিকেরা এই জের টানিয়াছেন শুধু কথা হিসাবে নয়, কথা হিসাবে, অর্থ হিসাবে, ছন্দ হিসাবে—সর্বতোভাবে।

বাঙালীর পয়ার, ইংরাজের heroic couplet বা ফরাসীর alexandrin ছিল একটা বিশেষ রুচির, মনোবৃত্তির, চেতনার প্রকাশ। প্রতি পংক্তি প্রতি পদ অর্থের ও ছন্দের যতি লইয়া নিজে নিজে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিত। তাহাদের কেহ নিজের সীমানা ছাড়িয়া অপরের সীমানায় প্রবেশ করিতে চাহিত না, তাহাতে যেন বর্ণসঙ্করের আশঙ্কা ছিল। তখনকার যুগের শিল্পীর চেতনায় প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক শব্দ এক-একটি সুষীম, পরিচ্ছিন্ন, গোটা সত্তারূপে আসিয়া দেখা দিত। শিল্পের কারুর কৌশলই ছিল তখন এই পরস্পর হইতে পৃথক বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টি-সকলের মধ্যে সাম্য সমন্বয় সঙ্গতি -স্থাপন। সে-যুগের সৌন্দর্যের প্রধান কথা ছিল সৌষ্ঠব, অঙ্গে অঙ্গে সঙ্গতি—সমানানুপাত, একটা জ্যামিতিক ক্রমানুগত্য (symmetry, balance)। আধুনিক চেতনায় অনুভবে কিন্তু কোন বস্তুই তাহার বিচ্ছিন্ন স্বকীয়তা লইয়া দাঁড়ায় না—যে সীমানা বস্তুকে বস্তু হইতে এক সময়ে পৃথক করিয়া রাখিত তাহা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, মুছিয়া গিয়াছে—কোন বৃত্তি কোন উপলব্ধি আর ভিন্ন নাই, একটির মধ্যে আর-একটি জুড়িয়া মিশিয়া গিয়াছে, সকলের সহিত সকলে ওতপ্রোত হইয়া আছে। মানুষ যেমন জাতি হিসাবে, জাতি হিসাবে, বর্ণ হিসাবে, গোষ্ঠী হিসাবে দিন দিন সকল পৃথকত্ব বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিতেছে, সমগ্র মানবসমাজে ঘনিষ্ঠতর আদান-প্রদানে একটা উদার সাম্য (হয়ত একাকারও) স্থাপিত হইতেছে, তেমনি মানুষের চেতনায় অনুভবে ও শিল্পীর রসবোধের মধ্যেও ঘটিয়াছে এই রকম মিশ্রণ সমীকরণ। অঙ্গবিন্যাসে যে মিল, অনুপাতসাম্য, যে সমতুলতা,

যে পরিস্থিতি আগের যুগের সৌন্দর্যের মাপ ছিল, তাহার পরিবর্তে বর্তমান যুগে সৌন্দর্যে আমরা চাহিতেছি একটা জটিলতর ছন্দের দোল, অনিয়মের ব্যতিক্রমের লীলা।

অতীতে ও আধুনিকে এই যে পার্থক্য, তাহা আমরা বলিতে পারি, হইতেছে melody ও harmonyর পার্থক্য। প্রাচীনের যেন একতারার একতানের গান, অথবা একতারার একতানের সুরের সমাহার বা সঙ্গত—তাহার বৈশিষ্ট্য সুরের বিশুদ্ধি। আধুনিক চাহিতেছে বহুতর বিসদৃশ মিশ্রিত সুরের ঝঙ্কার।

এই দিক দিয়া বাঙলা ও বাঙালী—বাঙলার সাহিত্য ও বাঙালীর চিত্ত যতখানি আজ আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে তাহার সব না হোক বেশীর ভাগ যে একা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে ঘটিয়াছে এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মধুসূদন অমিত্রাক্ষরকে আনিলেন, কিন্তু তবু তাঁহার ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। মাত্রাবৃত্তকে ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিলেন, চলিত করিয়া দিলেন আধুনিকের একটা বৈশিষ্ট্য। কথায়, ছন্দে, ভাবে তিনি আনিয়াছেন মুক্তির, গতির দোল—একটা সমৃদ্ধতর, জটিলতর, উদারতর, সূক্ষ্মতর সামঞ্জস্য—সৌন্দর্য। পুরাতনের কবি যখন বলিতেছেন—

> কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
> পদনখে পড়ে তাঁর আছে কতগুলা॥

কিম্বা বঙ্কিমের ভূয়সী প্রশংসা পাইয়াছে যে—

> চলে যান বিবিজান লবেজান করে—

তাহা হইতে কত দূরে আমরা চলিয়া আসিয়াছি যখন শুনি—

"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"—
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়—"

অথবা

ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।

ভাবের প্রেরণায় বুদ্ধিকে শাণিত উন্নীত করিয়া, বুদ্ধির সহায়ে ভাবকে বৃহৎ বিচিত্র করিয়া, বাহ্যেন্দ্রিয়কে অন্তরেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে গভীরতর রসায়িত করিয়া, বিভিন্ন স্তরের নানা অনুভবকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, সম্মিলিত, সুসম্বদ্ধ করিয়া, সমস্তকে একটা উদার লঘুপক্ষ ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত রূপায়িত করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে কল্পলোক রচিয়াছেন তাহার মধ্যে আধুনিক জগৎ তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার স্বপ্ন-উপলব্ধি লইয়া দেখিতে পাইয়াছে নিজের গভীর প্রকৃতির একটা প্রতিরূপ।

আজ বাঙলার রসরচনায়—শুধু রসরচনায় কেন, সাধারণভাবে সমস্ত সাহিত্য-রচনাতেই—যে সামর্থ্য, যে নৈপুণ্য, যে একটা উদাত্ত সুর সহজ স্বাভাবিক এমন কি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম লেখনী ধরিয়াছিলেন তখন কেবল আদর্শের দূর-লক্ষ্যেরই বিষয় ছিল। অর্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া রবীন্দ্রনাথ যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করিয়াছেন সেই ভাণ্ডার তাঁহার উত্তরাধিকারী আধুনিকেরা

আমরা সকলে যথেচ্ছ যথাসামর্থ্য আহরণ করিতেছি, ভোগ করিতেছি —অনেক সময়ে মনে করিতেছি, তাহা বুঝি আমাদেরই নিজস্ব প্রতিভার উপার্জন।

রবীন্দ্রনাথ যে একটা বিপুল উত্তুঙ্গ তরঙ্গ আনিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহাতে ভাসিয়া চলিয়াছি; কিন্তু ঢেউএর মাথায় স্থান পাইয়াছি বলিয়া, অনেক সময়ে বুঝিতেই পারি না আমবা কতদূর উঠিয়াছি, আবার অনেক সময় ঢেউএর কথা ভুলিয়া গিয়া মনে করি এই উন্নয়ন আমাদের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব। সাবালক সমৃদ্ধ ভাষার একটা লক্ষণই এই যে, তাহাতে যে-কেহ কিছু রচনা করিতে চেষ্টা করে সে হাতের মধ্যে পায় একটা তৈয়ারী যন্ত্র—যন্ত্র তাহাকে গড়িবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না, তাহার পক্ষে প্রয়োজন কেবল যন্ত্রকে খেলাইবাব কৌশল। সে-সাহিত্যের জগতে কোন শিল্পীই একটা বিশেষ ধাপের, স্বরগ্রামের নীচে নামিয়া পড়িতে পারেন না —ভাষার সাহিত্যের এমন একটা শক্তি-সামর্থ্য, এমন কারুগত ধরণ-ধারণ নিজস্ব প্রকৃতিভুক্ত হইয়া যায় যে, তাহাই কারিগরকে চালাইয়া লয়, কারিগর যদিই বা তাহাকে না চালাইতে পারে। অবশ্য বলি না, বাঙলা তাহার সমৃদ্ধির পরিপুষ্টির চরমে পৌঁছিয়াছে; কিন্তু যতখানি সমৃদ্ধি পরিপুষ্টি হইলে বলা যায় পূর্ণযৌবনের আরম্ভ তাহা আনিয়া দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। আবার এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাতে কার্যত যতখানি না করিয়াছেন, তাহার বেশী করিয়াছেন ভাবের দিক দিয়া, অসাক্ষাতে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া।

আমরা আধুনিক কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। এখন জিজ্ঞাস্য

হইতে পারে, আধুনিক অর্থে অতি-আধুনিকও বুঝিক কি না। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে একটা চির-তারুণ্যের গতি, যৌবনরসে উচ্ছল ছন্দ বহমান, তাহার ধর্মই নিত্য নূতনের দিকে চলা, অভিনবের সাথে পরিচয় স্থাপন করা—সবুজকে সাদরে বরণ করা। সুতরাং আধুনিকতমেরও সহিত তাঁহার একটা সহানুভূতি, একটা সৌহার্দ্য কোথাও থাকাই স্বাভাবিক। তবুও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে—রবীন্দ্রনাথ হইতেছেন সকলের উপরে রূপের—সুরূপের, আকারগত সৌষ্ঠবের পূজারী। রূপের কাঠামোকে ভাঙিয়া বদলাইয়া যতই তরল, যতই নমনীয় করুন না, তবুও পরিশেষে কাঠামো—একটা সুষীম কাঠামোই—তিনি দিয়াছেন। অতি-আধুনিকেরা কাঠামো বলিয়া কোন জিনিষ আদৌ রাখিয়াছেন কি না সন্দেহ—গঠনকে জলীয়, জলীয় নয়, প্রায় বাষ্পীয় করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা। মিলের ত কথাই নাই, সুনিয়মিত তাল ও যতিও তাঁহারা নির্বাসন দিয়াছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের উল্লিখিত সকল রকম দোষ তাঁহারা অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য যদি চাই তবে 'পূরবী'র

দেখো চেয়ে কোন্ উতলা পবন-বেগে
সুরের আঘাত লেগে
মোর সরোবরে জলতল ছুলছলি'
এ-পারে ও-পারে করে কী যে বলাবলি
তরঙ্গ উঠে জেগে—

কিম্বা 'বলাকা'র

পর্বত-চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,

তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধরে' চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা—

হয়ত বলিতে পারি, দিতেছে আধুনিকতমের একটা ছায়া বা আভাস —একটা মোলায়েম মার্জিত মূর্তি। কিন্তু তবু অতি-আধুনিক তাহার গতিবিধিতে দিতে চায় যে একটা বিপর্যয়ের প্রলয়ের ওলট-পালটের সুর তাহা এখানে পাই না। মনে হয় এতখানি নবীন, এতখানি আধুনিক হইয়াও দূর অতীতের অন্তরস্থ সত্তার সাথে তাঁহার একটা নাড়ীর সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি কাটিয়া ফেলিতে চাহেন নাই।

এই একটা নিগূঢ় স্থিতিশীলতাই তাঁহাকে প্রতিমার পূজারী করিয়া রাখিয়াছে—তাঁহাকে একান্ত বিপ্লবী মূর্তিভঙ্গকারী হইতে দেয় নাই। ফলত রবীন্দ্রনাথের কারুপদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আমরা এখানে আকর্ষণ করিতে পারি—রূপকে কাঠামোকে তিনি অনেক সময়ে লীলাচ্ছলে খুব দৃঢ় বাঁধনেরই মধ্যে রাখিয়া তবে গড়িয়াছেন; অবন্ধনকে মুক্তিকে তারল্যকে অনিশ্চিতকে তিনি খেলাইয়া তুলিয়াছেন কথার চেয়ে বরং ছন্দের মধ্যে, ছন্দের চেয়ে চিন্তার মধ্যে, এবং চিন্তারও চেয়ে বরং ভাবের মধ্যে। রূপগত গঠন-দার্ঢ্যেরই মধ্যে এই প্রকারে একটা অপরূপ কমনীয়তা নমনীয়তা লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছেন—শরীরের মধ্যে অশরীরীকে, সীমার মধ্যে অসীমকে স্থাপন করিয়াছেন—অসংখ্য বন্ধনের মাঝে

মুক্তির স্বাদ তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন। আরও, সকল নৈকট্য ও অবাধ পরিচয় সত্ত্বেও হাবে-ভাবে চলনে-বলনে তাঁহার কবিত্বে সর্বত্রই আছে একটা আভিজাত্য, একটা গরিমা, ইহাও সম্পূর্ণভাবে অতি-আধুনিক হইবার পক্ষে তাঁহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জয়ন্তী-উৎসর্গ, ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা

দ্বিতীয় পর্যায়

রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে বঙ্গসাহিত্য আধুনিক হয়ে উঠেছে এবং বিশ্ব-সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত হয়েছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার এই দান-বৈশিষ্ট্য আমরা সকলেই বোধ হয় একবাক্যে স্বীকার করি। বঙ্কিমচন্দ্র বা তারও আগে, একেবারে গোড়ায়, রামমোহনে বাঙালীর সাহিত্যজগতে এই আধুনিকতা ও বিশ্বভাব সুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এ দুটি ধারা যেমন উপচিত সমৃদ্ধ ও বিচিত্রগতি হয়ে উঠেছে তা দেখে এই উপমাটি মনে হয় যে তাঁর পূর্বে বঙ্গবাণী ছিল যেন—কালিদাসের ভাষায়—'বেণীভূতপ্রতনুসলিলা', আর তাঁর পরে সে হয়ে উঠেছে উভয়কূলপরিপ্লাবী ফেনিল উর্মিল সাগরসঙ্গম।

সে যা হোক, এখানে রবীন্দ্রনাথের এ দিকটির পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আজ আধুনিকতার (ও বিশ্বমানবতার) প্রবাহ এত দূর চলে গিয়েছে, এত সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে যে, তা প্রায় অতিমাত্রার ও বিকৃতির পর্যায়ে উঠেছে গিয়ে। এখন সময় ও অবস্থা এসেছে যখন মনে হয় দৃঢ় উদাত্ত কণ্ঠে বলা প্রয়োজন হয়েছে—'একবার ফিরাও মোরে', বর্তমানের, দারুণ আধুনিকতার উপপ্লব ও পরিপ্লাবন থেকে প্রাচীনের, সনাতনের দুই-একটা মহাসত্য, সমুচ্চ উপলব্ধি রক্ষা করা আজ আশু কর্তব্য হয়ে উঠেছে। আমি তাই বলতে চাই—রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক ও বিশ্ববাসী হলেও তাঁর মধ্যে

অক্ষুণ্ণ রয়েছে, মূর্তি পেয়েছে প্রাচীনের ও দেশীয়ের অন্তঃস্থ কয়েকটি সনাতন চিরন্তন সত্য ও উপলব্ধি।

কি তবে সেই বাঞ্ছনীয় পুরাতন ও সনাতন সত্য? সেগুলি পুরাতন ও সনাতন স্বতঃসিদ্ধ। মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গেই বোধ হয় তাদের জন্ম হয়েছে; যুগে যুগে দেশে দেশে তারা মানুষের গভীরতম নিবিড়তম উচ্চতম প্রিয়তম আশা ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ভগবান্‌-ঈশ্বর-পরমাত্মা, সত্য-ঋত-বৃহৎ, আনন্দ-অমৃত, চৈতন্য-আনন্ত্য, উত্তম জ্যোতি, পরা শান্তি—এইসব অতিপরিচিত জিনিষগুলিরই কথা আমি বলছি। এই যত অপার্থিব অতীন্দ্রিয় অব্যবহার্য জিনিষ এরাই মানুষের চেতনায়, তার যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে কি পিছনে, প্রকট কি প্রচ্ছন্ন রয়েছে—এরাই গড়েছে মানুষের সূক্ষ্মাত্মা যাকে আশ্রয় করে চলেছে তার জীবনলীলা, তাতেই প্রোত রয়েছে তার প্রকৃতির সকল রূপায়ণ—মণিগণা ইব। এইসব প্রাচীন সত্যই তাদের পূর্ণ সুষমা ও প্রভায় রবীন্দ্রনাথে পরিস্ফুট, তিনি তাদের সচেতন ও একনিষ্ঠ পূজারী। বর্তমানের মানবচেতনা যুগধর্মবশত যেন এই সকল প্রাচীন পুরাতন সম্পদ অগ্রাহ্য করে চলতে চায়, মায়া মতিভ্রম বলে ঘোষণা করে। কেহ বা এদের গণনার মধ্যেই আনে না, সম্পূর্ণ উদাসীন এদের প্রতি, কেহ বা এদের উপর বিশেষ জোর দেয়, বিরোধী বিপজ্জনক মানুষের শত্রু ব'লে। তবে উভয়েরই লক্ষ্য ঐহিক লৌকিক স্থূল সামগ্রী ও ঐশ্বর্য, তারা চায় 'ইদং'-এর 'প্রেয়ে'র উপাসনা। এ ধারা সম্প্রতি আবার এত স্ফীত ও দুর্বার হয়ে উঠেছে যে মানবজাতির সমগ্র চেতনাকে অভিভূত করে গ্রাস করে ফেলবার উপক্রম করেছে। বর্তমানের কবি ও স্রষ্টা—আধুনিক নামে যাঁরা

নিজেদের অভিহিত করতে চান তাঁরা—জোর গলায় স্পষ্টই জানাচ্ছেন : 'আমরা আকাশের পূজারী নই, আমরা ধূলির সেবাইত —আত্মার নয় রক্তমাংসের, অনন্তের নয় ক্ষণিকের, আনন্দের অমৃতের নয় তীব্র বেদনার ও মৃত্যুর নবী ও কবি।'

কেবল লক্ষ্যের দিক দিয়ে নয় উপায়ের দিক দিয়েও, বস্তুর দিক দিয়ে নয় রীতির দিক দিয়েও এসেছে অনুরূপ পরিবর্তন ও বিপর্যয়। স্বভাবের মেজাজের ধারায় দেখা দিয়েছে এক বৃহৎ বৈরূপ্য ও বৈপরীত্য। প্রাচীন জীবনের ও শিল্পের ধারা ও ধরণ, অর্থ, আভিজাত্য —মহত্ত্ব, গুরুত্ব (ম্যাথু আর্নল্ডের high seriousness স্মরণ করা যেতে পারে), সংযম সামঞ্জস্য সৌষীম্য, শ্রী ও হ্রী। প্রাচীনের চলনে বলনে এই গুণগুলি ফুটে উঠেছে, এদের ছাড়া তার সৃষ্টি নাই। ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতার বনিয়াদ যে গ্রীকো-লাতিন প্রতিভা তা ঠিক এই রীতিকে একান্ত করে গ্রহণ করেছিল। বর্তমান যুগে আমরা ওসব বদলে দিয়েছি—আভিজাত্য, শ্রী, হ্রীর বালাই আমাদের নাই। হেলেনিক দেবতাকে ত বিসর্জন দিয়েছিই, হেব্রায়িক দেবতাও আর আমাদের ইষ্ট হতে পারছেন না—আমরা এখন নর্ডিক (Nordic) দেবতার, থর ও ওডিনের পূজারী।

ফলত মনে হয় গ্রীকো-রোমক জগতের পতনকালে যে অবস্থা হয়েছিল, বর্তমান যুগে ঠিক সেই রকমই এক অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপের উত্তরাপথ হতে বর্বরবাহিনী রোমক সাম্রাজ্যের উপর যখন প্রলয়পয়োধিজলরাশির মত এসে ভেঙে পড়ল, তাতে ধ্বসে গেল ভেসে গেল প্রাচীনের শিক্ষাদীক্ষা। গ্রীকো-রোমক আদর্শ মানুষকে দিয়েছিল যে একটা বিশিষ্ট শোভন সুচারু গড়ন, তার পরিবর্তে

ধ্বসে পড়ল সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, অশোভনতা, রূঢ়তা—চেতনার ক্ষীণতর দীনতর পরিম্লায়মান দ্যুতি। আভিজাত্যের পরিবর্তে দেখা দিল সাধারণ্যের জনতার ধর্ম—অর্থাৎ চপলতা চঞ্চলতা মুখরতা স্থূলতা ব্যামিশ্রতা, সংযমের দার্ঢ্যের আত্মস্থতার সম্পূর্ণ বিলয়—তলা থেকে একটা অজ্ঞানের তামসিকতার আবির্ভাব, যার চাপে সর্বগঠন ক্রমে ফেটে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে থাকে। এই ভাবেই সমাজ উৎসন্নে যায়। এ কথা ঠিক গ্রীকো-রোমক শিক্ষাদীক্ষা ভেসে গেল বিনষ্ট হল বটে, কিন্তু তার পরে ফলে এল অপেক্ষাকৃত নূতন অভিনব আধুনিক সংস্কৃতি। কিন্তু প্রথম কথা, সে নবসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয়েছিল কয়েক শতাব্দী—বিপ্লবের ভাঙনের জের শেষ হতে, তার ভোগকাল সমাপ্ত হতে—তাব পর, নূতনের যখন গোড়াপত্তন হল এবং সত্যকারের সৃষ্টি সুরু হল তখনও আবার সেই পুরাতন গুণ বা ধর্মেরই কাছে যেতে হল; যতই নূতন ভাবে, ভোল পরিবর্তন করে হোক। রোমান্স ভাষা ও সাহিত্য গড়ে উঠল রূপ গ্রহণ করল, মানুষ যখন আবার ফিরে অর্জন করল একটা অন্তরের আভিজাত্য, চলনে বলনে একটা শ্রী ও হ্রী।

আধুনিক সর্বতোমুখী ভাঙনের কল্লোল-কোলাহলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে দেখি অটল পর্বতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত তবু প্রাচীনের পুরাতনের শ্রীময়ী হ্রীময়ী বাণী—পুরাণী প্রজ্ঞা। আধুনিককে আধুনিক করে তুলতে তাঁর মত বোধ হয় আর কেউ পারে নাই, অর্থাৎ আধুনিকের অন্তরাত্মার দ্যুতি দিয়ে আধুনিককে গঠন করতে তিনি কথায় ও কাজে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক যখন হয়ে পড়ল আধুনিকের চর্ম বা খোলসের একটা রঙ-

ঢঙকে অতিরিক্ত করে তোলা, তখন তাতে তাঁর সায় আর মিলল না। তখন তিনি উপনিষদ্‌বার্তার নবী।

আধুনিকতার এক বৈশিষ্ট্য সার্বজনীনতা। বহুল শিক্ষাদীক্ষা, বিভিন্ন দেশকালগত বিচিত্র চিন্তাধারা বর্তমান মানুষের চিত্তে যুগপৎ অধিষ্ঠিত, সংমিশ্রিত, এতখানি ও এত রকম ভঙ্গীতে—ইদৃক্‌তয়া-রূপমিয়ত্তয়া বা—যে, তার তুলনা অন্য কোন্ যুগে আর পাওয়া যায় না। এ সার্বজনীনতা, গীতোক্ত বর্ণসঙ্করের মত, হয়ে পড়েছে বলা যেতে পারে "সংস্কৃতিসঙ্কর'। আধুনিক দুই-একজন কবি সজ্ঞানে এই আদর্শের রীতির চর্চা করেছেন, ফুলিয়ে ফলিয়ে দেখিয়েছেন। এজরা পাউণ্ড তাঁর কবিতায়—গুরুগম্ভীর কবিতারই মধ্যে—ইংরেজি বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয়, গ্রীক, লাতিন লাইনকে লাইন পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়েছেন, এলিয়ট সংস্কৃতের দ্বারস্থ পর্যন্ত হয়েছেন, জয়েস ত এক রকম সার্বজনীন ভাষাই (composite ও cosmopolitan) সৃষ্টি করেছেন। দেশে দেশে বা অতীতে বর্তমানে একটা বিনিময় বা সংমিশ্রণ ন্যূনাধিক পরিমাণে সর্বদাই আছে। বিদেশীয় ঐশ্বর্য আমদানি করা কবিদের (এক গ্রাম্য বা লোক-কবি ছাড়া হয়ত) একটা স্বধর্ম বললেই চলে। মিলটন ইংরেজি ভাষায় সমগ্র লাতিন ভাষাকে সাহিত্যকে প্রায় অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন, ফরাসী ভাষায় রঁসার অনুপ্রবেশ করান গ্রীক ও ইতালীয় কাব্যের ও ভাষার রঙ ও ঢঙ। প্রাচীন কালে এ রকম ছিল, আধুনিক কালের ত কথাই হতে পারে না, আধুনিক কালে সমস্ত জগৎ ও মানবজাতি

যখন সহজ অবাধ ক্ষিপ্র গতায়াতের কল্যাণে এতখানি সংহত ও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে (কাল হিসাবেও, অতীতের নানা শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে আমরা এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করেছি) যে, এ ধরণের আদানপ্রদান ও সংমিশ্রণ বা 'সঙ্কর' অনিবার্য, স্বাভাবিক।' তবু কথা আছে।

সর্বজন যেমন সত্য, বিশেষজনও তেমনি সত্য। সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টি ও গোষ্ঠী সমানভাবে সত্য বা বাস্তব। বিশ্বমানবতা রয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক দেশের জাতির ভাষার যে পৃথক্ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে তা অগ্রাহ্য করবার নয়—শুধু তাই নয়, জীবন্ত সৃষ্টির জন্য এ জিনিষটির উপর প্রতিষ্ঠা অবশ্য প্রয়োজন। এসব কথা এতখানি বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেই সন্ধিস্থল, সেই মাধ্যমিক স্থিতি—golden mean—আবিষ্কার করতে পেরেছে—বিনা আয়াসে, অবহেলায়, স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক প্রেরণার বশে—যেখানে মানবচেতনার এই দুটি প্রান্ত অপূর্ব সামঞ্জস্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যকে কতখানি আধুনিক ও বিশ্বজনীন করে তুলেছেন—এই দিক দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে বিচার বিশ্লেষ করে অনেকে এক সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন, গোঁড়া গৌড়ীয়পন্থীরা তাঁকে বাংলায় ফেরঙ্গ-সাহিত্যের প্রবর্তক বলে বিবেচনা করতেন। অবশ্য ইউরোপীয় হাবভাব রবীন্দ্রসাহিত্যে রয়েছে রাশি রাশি—চিন্তা বা বিচারগত সিদ্ধান্ত ছাড়াও তিনি তাঁর অনুভব উপলব্ধির যে রূপাবলী সৃষ্টি করেছেন, তিনি যে একটা জগৎ (বা mythology) রচনা করেছেন তার উপাদান অনেক পরিমাণে এসেছে ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি হতে। কিন্তু জাতীয় প্রতিভার

সঙ্গে তিনি ঐ সকল এমন মিলিয়ে একীভূত করে ধরেছেন যে তাদের পরদেশী পরধর্মী বলে আর অনুভব হয় না, তাদের পৃথক্ করে আবিষ্কার করাও সব সময় সহজ হয় না। বিশ্বমানবের বা বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে সমচিত্ত হয়েও বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে অটুট রয়েছে—বঙ্গীয় কবিপ্রতিভার কেন্দ্রকে ধরেই তাঁর কাব্যসৃষ্টির পরিধি বিস্তৃত—সে পরিধি যত দূরেই চলে যাক না, সেই অন্তঃপুরুষের কেন্দ্রই সেই পরিধিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

বাঙলার সাহিত্য বা রসসৃষ্টিতে আজকাল উৎকেন্দ্রতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং তার মাত্রা দিন দিন বর্ধিত হয়ে ভয়াবহ হয়ে উঠছে। ইংরেজের ইউরোপের শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে প্রথম সংস্পর্শের যুগে আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে যে একটা উন্মাদকতা ও উৎকেন্দ্রতা দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তা একটা শান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করে। আজ আবার আরও গভীরতর ব্যাপকতর এক উন্মাদকতা ও উৎকেন্দ্রতা দেখা দিয়াছে। সকল মানুষ, যাবতীয় জনসঙ্ঘ, বিবিধ শিক্ষাদীক্ষাকে আমরা আলিঙ্গন দিতে উন্মুখ ও ব্যাকুল। আধুনিকেরা এই একটি আদর্শের রীতির ঢঙের একমুখী ধারায় চলবার ঝোঁকে ভুলে গেছেন বিশেষ ভাষা-সাহিত্য শিক্ষা-দীক্ষার যে অন্তঃপুরুষ তার স্থিতির কথা। এ বস্তুটি অতি সূক্ষ্ম সন্দেহ নাই, এর পরিধি যে কোথায় কত দূরে গিয়ে থামতে পারে তার নিয়মও কিছু নাই। তবুও সীমা ও সীমানা একটা আছেই—যার এ দিকের সৃষ্টি হল জীবন্ত স্বাভাবিক, অপর দিকে তা কৃত্রিম অনুকরণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথে একটা গভীর রসবোধ, একটা সূক্ষ্ম মাত্রাজ্ঞান এই সীমা ও সীমানার অব্যর্থ সন্ধান অতি সহজেই দিতে

পেরেছে। এক বিশ্বমুখী বিশ্বপ্রেমময় প্রেরণা তাঁর অন্তরাত্মার পরিধিকে প্রসারিত করে করে বহু দূরে চলে গিয়েছে, যত দূর সম্ভব, অথচ অন্তরাত্মার সূত্রকে কেটে উধাও হয়ে যায় নাই। তাঁর কবিচিত্ত বৈদিক ঋষির মতনই বলছে যেন—

যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আবর্তয়ামসীহ[১]—

তোমার যে মন এই সারা বিশ্বের মধ্যে সুদূরের পারে চলে গিয়েছে, তাকে আমরা এই এখানে আবার ফিরিয়ে এনেছি।

নূতন যুগে নূতন জগতে নূতন সৃষ্টির অবসর ও প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এমন কতকগুলি সত্য আছে যা চিরন্তন, সনাতন, নূতনের মোহে তাদের অবজ্ঞা করা ও প্রত্যাখ্যান করা অর্থ জীবনের সৃষ্টির মূল উচ্ছেদ করা। অতীত জগতের শ্রী ও হ্রীর কথা বলেছি —তারা হল সর্বাঙ্গসুষ্ঠু সম্যক্‌সৃষ্টির আবহাওয়া। শ্রী ও হ্রীর অর্থই হল মাত্রাবোধ। বর্তমান যুগে ঠিক এই দুটি জিনিষকেই আমরা বিসর্জন দিয়ে ফেলেছি—জীবনে ও শিল্পরচনায (স্মরণ করা যায় 'দাদা' Dada-তন্ত্রীদের কথা)। কিন্তু ফিরে ও-দুটির আশ্রয়ে আসতেই হবে—যদি সত্যকার সৃষ্টি কিছু আমাদের প্রয়াসের লক্ষ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ আর কিছু হন বা না-হন তিনি শ্রী ও হ্রীর জাগ্রত জ্বলন্ত বিগ্রহ।

শ্রী ও হ্রী আবার যখন একটা অবয়ব গ্রহণ করে, অনন্তের

---

১ ঋগ্বেদ, ১০।৫৮-১০

অসীমের প্রকাশও যদি তার মধ্যে স্ফুট হয় তবুও, তখন তাকে একটা দেশকালপাত্রের মধ্যে সসীম বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করতে হয়। এই বিশিষ্ট আকারের সুষীম সৌন্দর্য, রূপনৈপুণ্য, সৃষ্টির ও শিল্পের এক চিরন্তন সত্য। ভগবান্ সর্বব্যাপী সর্বময় সর্বাতীত হলেও যেমন আবার মানুষী তনু গ্রহণ করেন—সেই রকম। একত্ব সত্য বটে, কিন্তু একাকার নয়। আমাদের আজকালের চেতনা বহুমুখী বহুল হয়ে গিয়েছে, একত্বকে রক্ষা করতে পারে নাই। যে একত্ব একাকার নয় অথচ বহুলকে সুষীমতা দিয়ে ধারণ করেছে তার নাম ঐক্য।

রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানের দিক দিয়ে হয়ত বৈদান্তিক কিন্তু অনুভবের, চিত্তরাগের, রসবৈদগ্ধ্যের দিক দিয়ে হলেন—বলা যেতে পারে pagan —মূর্তি-উপাসক। তাঁর অন্তশ্চেতনার এই ভাবটিই তাঁকে অতিমাত্রা থেকে রক্ষা করেছে—যতই তিনি গতিপন্থী হোন না, চঞ্চলের মধ্যে স্থাণু যে বস্তু, তার সঙ্গে তাঁর নিত্যসংযোগ বজায় রেখেছে।

প্রবাসী, ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথের ভাষা

রাংলা ভাষা যদি জগতের ভাষা হয়ে থাকে, অর্থাৎ তার প্রাদেশিক উপভাষাগত গড়ন-চলন অতিক্রম করে যদি বিশ্বের মুখ্য কয়টি ভাষার মধ্যে স্থান পেয়ে থাকে, তবে তার মূলে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আজ আমাদের হাতে ভাষাটির ঐশ্বর্য এত সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে যে আমরা হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না যে রবীন্দ্রনাথের অর্ধশতাব্দীব্যাপী অফুরন্ত বিপুল সৃষ্টির পূর্বে তার ঠিক সে রূপ বা অবস্থা ছিল না। আমি সাহিত্যের কথা বলছি না, আমি বলছি কেবল ভাষার শব্দসম্ভারের, বাক্যের, বাক্যগঠনের, ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্যের কথা। ভাষার সামর্থ্যের পরিচয় তার প্রকাশ-ক্ষমতায়—কত বিভিন্ন রকমের কথা যে ব্যক্ত করতে পারে এবং কত যথাযথভাবে, তার উপরে। রাংলার ক্রমোন্নতি-ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রধান ও গোড়াকার পৈঠা। কিন্তু বঙ্কিমের সময়ে বঙ্গভাষার ছিল কৈশোর মাত্র—অত্যধিক পক্ষে, প্রথম যৌবন—তার গঠন তার গতিবিধি ছিল অনেকখানি সংকীর্ণ, পরীক্ষামূলক, অনিশ্চয়তাসঙ্কুল। রবীন্দ্রনাথই সেখানে এনে দিয়েছেন পূর্ণ যৌবন, পরিণত সামর্থ্য, নিঃসন্দেহতা, বহুল বিচিত্র প্রতিভা। বঙ্গভাষার বৃদ্ধি ও বিকাশের এখনও শেষ হয় নি, এখনও সে কাজ সমান জোরে চলেছে, তাই প্রৌঢ়তার সুপরিপক্বতার কথা বললাম না। বঙ্কিমের যুগ অবধি ইউরোপীয় বা আধুনিক

ভাবভঙ্গীর প্রকাশ বাংলায় অনেকখানি দুষ্কর ছিল, তাতে থেকে যেত একটা কষ্টকল্পনা, আড়ষ্টতা (উদাহরণ, অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার')। বঙ্কিমচন্দ্রই এ ধারাটি সহজ সুগম করে তোলবার সূত্র ধরে দিয়েছিলেন—তবে তা'ও কেবল সূত্রপাত। কিন্তু আজকাল? ইউরোপ-আমেরিকার ত কথাই নাই, ফিনলণ্ড-গ্রীনলণ্ড কি বাসুটো-জুলুর কথা অথবা সুপ্রাচীন মিশর-বাবিলনের কথা পর্যন্ত সহজে ও সম্যক্ প্রকাশ করবার ক্ষমতা বাংলার হয়েছে। এই যে বিপুল পরিবর্তন বা বিবর্তন তার প্রধান হেতু রবীন্দ্রনাথের প্রায় অঘটনঘটনপটীয়সী বাক্‌প্রতিভা—সাক্ষাৎভাবে এবং তার বেশী অসাক্ষাৎভাবে, অর্থাৎ অদৃশ্য প্রভাবে সে প্রতিভা এ কাজটি করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথ কত যে নূতন শব্দ সৃষ্টি করেছেন, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করলে খুবই শিক্ষাপ্রদ হয়। পুরাতন অর্থাৎ অভিধানগত কত শব্দ তিনি সচল সজীব নিত্যনৈমিত্তিক করে দিয়েছেন, আবার কেবলমাত্র মৌখিক উপভাষার কত শব্দ তিনি সাহিত্যিক পদবীতে উন্নীত করে ধরেছেন তার পরিমাণ কম নয়। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের শব্দচয়নে এক বিশেষত্ব আছে—তাতে তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভার স্বরূপটি ফুটে উঠেছে। প্রথমত, তাঁর শব্দ সব মনে হয় যেন বাংলার প্রাণ হতে, মর্ম হতে উৎসারিত—পণ্ডিতের বৈয়াকরণিকের নির্মিত নির্ভুল সাধু বর্ণসমষ্টির জড়ত্ব সেখানে নাই, অন্য দিকে আবার নাই তাতে সকল বিধিনিষেধ-বিরোধী খাম-খেয়ালীর উদ্ভটতা বা কৃত্রিমতা—এমন স্বাভাবিক সরল, ভাষার স্বধর্মের গড়ন-চলনের সঙ্গে এমন তারা মিলেমিশে খাপ খেয়ে যায়।

দ্বিতীয় হল, শব্দের সুষমা ও লালিত্য। শব্দের সহজ প্রকাশ-সামর্থ্য থাকা চাই—তার হওয়া চাই সজীব প্রাণবন্ত—আরও হওয়া চাই সুন্দর ও মধুর। রবীন্দ্রনাথের শব্দকোষে এই তিনটি গুণই পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। অন্য দিকে, তাঁর ভাষায় অসুন্দর, নির্জীব, আড়ষ্ট, দুর্বল, কর্কশ, শ্রুতিকঠোর বলে কিছু নাই—সত্যই তাঁর ভাষা সর্বতোভাবে শ্রীময়ী, লক্ষ্মীময়ী, তিলোত্তমা—

সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।

রবীন্দ্রনাথের বাক্‌দেবী সুন্দরের সুষীমতার পারিপাট্যের পরাকাষ্ঠা। বঙ্কিমের ভাষাও সুন্দর ও শ্রীময়—তা খুরুষালী নয়, তাও রমণীয়, তবে তাতে রবীন্দ্রনাথের মত এতখানি রমণীয়তা মধুরতা, লালিত্য কমনীয়তা নাই। তা ছাড়া প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যও রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। বঙ্কিম সরল শোভন এবং স্বচ্ছ—তাতে রয়েছে যাকে বলে ক্লাসিকের শালীনতা সংযম, স্থিরতা ও স্পষ্টতা। বঙ্কিম স্মরণ করিয়ে দেন ফরাসী ভাষার কথা—রাসীন বা ভল্‌তেয়ারের ফরাসী ভাষা। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে, আবহাওয়ায় পাই রোমান্টিকের চিত্তস্ফূর্তি—তাই তাঁর ভঙ্গীর লক্ষণ ঋজুতা ততখানি নয় যতখানি কারুতা, স্বচ্ছতা ততখানি নয় যতখানি বর্ণবিলাস, সারল্য নয়, আলঙ্কারিতা। চিন্তার ভাবের অনুভাবের কত রকমারি গমক প্রতিধ্বনি তাঁর ভাষা স্ফুলিঙ্গের মত প্রতি পদে চারি দিকে ছড়িয়ে চলেছে। ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতা, বক্রোক্তির রেশ, চলনের লীলায়িত সৌকুমার্য আমাদিগকে আর-এক জগতের দুয়ারে প্রতিনিয়ত নিয়ে চলে। প্রত্যক্ষের বিচারবিতর্কের, যুক্তির যে ধারা

ও ধরণ তাতে রবীন্দ্রনাথের রচনারীতি গঠিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় নি। স্পর্শালু চিত্তের, তীব্র বোধশক্তির, নিবিড় উন্মুখী আদর্শপ্রিয়তার যে সহজাত বিবেক বা আকর্ষণ-বিকর্ষণ তা'ই দিয়েছে তাঁর ভাষার গড়ন ও গতি। তর্কবুদ্ধি বা যুক্তি এখানে তার পৃথক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়ায় নি—সে জিনিষ এক সরস প্রাণের অপরোক্ষ অনুভবের যেন পরোক্ষ স্ফুরণ। দৃঢ়গ্রন্থি, গাঢ়বন্ধ, প্রশান্ত প্রসন্ন হওয়ার অবকাশ বা প্রয়োজন এ ভাষার তেমন নাই—তার প্রয়োজন আবেগ, বেগ, ধার—এ যেন রবীন্দ্রনাথের নিজেরই সুরসভাতলে নৃত্য করে চলে যে বিলোলহিল্লোল উর্বশী তারই পায়ের ছন্দ।

কিন্তু তাই বলে উচ্ছ্বসিত, কেবলই ভাবাবেগ-ফেনিল এ ভাষা নয়—এখানেও আছে বাঁধন, সংযম, বাঁধন সংযম ছাড়া ভাষার পারিপাট্য সৌষ্ঠব কখনও আসতে পারে না। তবে সে বাঁধন এখানে নির্ভর করে লীলায়িত গতির উপর ছন্দের উপর—তার যতি, তার নিজস্ব পদক্ষেপের মাপের উপর। ক্লাসিক-রীতিতে প্রতিফলিত বুদ্ধির স্বচ্ছতা, যুক্তির বাঁধন ও দৃঢ়তা, প্রমাণ-ক্রমের নিরাভরণতা (যথা, ম্যাথু আর্নল্ড), কিন্তু আমাদের কবির রচনায়, কবির গদ্য রচনাতেও, দেখা দেয়, বুদ্ধির লজিক হয়ত নয়, কিন্তু অনুভবের লজিক—এ লজিক আরও জীবন্ত সচল।

বাংলার তৃতীয় যে ভাষাশিল্পী—আমি বলছি শরৎচন্দ্রের কথা—তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বৈরূপ্য আমরা এখানে লক্ষ্য করিতে পারি। শরৎচন্দ্রের ভাষা বঙ্কিমের মতই ঋজু স্বচ্ছ সরল—তবে বঙ্কিম সব সময়ে মণ্ডন অলঙ্কার অপছন্দ করেন না—কিন্তু শরৎচন্দ্র একান্ত নিরাভরণ। কিন্তু এই নিরাভরণতার হেতু তাঁর যুক্তিতন্ত্রতা নয়—

হেতু, তিনি দৈনন্দিন ভাষা, সাধারণের ভাষা, সকলের সুখদুঃখের ভাষার ছাঁচে ঢেলে তাঁর ভাষা গড়েছেন, তবে তাকে মেজে ঘষে পরিষ্কার করে ঝরঝরে তকতকে করে নিয়েছেন। স্পষ্টতা ঋজুতা সত্ত্বেও বঙ্কিমের হল গুণীজনের ভাষা—নাগরিক বা পৌর ভাষা, শরৎচন্দ্রের বলা যেতে পারে 'গ্রামিক' (গ্রাম্য বলা দোষ হবে) বা জানপদ ভাষা। তবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য এইখানে যে উভয়ের ভাষাই গতিমান, এমন কি খর গতিমান, বেগময়, এমন কি তীব্র বেগময়। যদিও গতির ভঙ্গিতে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা দ্রুত চলেছে বটে কিন্তু এঁকেবেঁকে, এদিক-সেদিক ঘুরেফিরে, আশেপাশে দেখে শুনে, অফুরন্ত মন্তব্য বক্তব্য প্রকাশ করতে করতে, কৌতূহলের ঝলক ছড়াতে ছড়াতে—তাতে ফুটে উঠেছে আল্পনার লীলায়িত রেখাবলী। শরৎচন্দ্র চলেন সোজা তাঁর লক্ষ্যে। জ্যামিতিক সরল রেখায় হয়ত নয়—তাঁর পথ ঈষৎ বক্র—বৃত্তাভাস—তীরমার্গের মত। এবং এ বক্রতা এসেছে আবেগের অন্তর্মুখী গাঢ়তা ও তীব্রতার চাপে। দামাস্কাস ইস্পাতের মত তা শাণিত ক্ষুরধার, নমনীয় অথচ সুদৃঢ়। বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের গতি হল ঝর্ণার—বহুল ধ্বনিতে বিচিত্র বর্ণে তা সমৃদ্ধ। শরৎচন্দ্রের হল নিঃশব্দে আকাশচারী লঘুপক্ষ পাখীর গতি। বঙ্কিমের মধ্যে আমরা পাই প্রশান্ত প্রসাদগুণ, পরিচ্ছিন্ন পারিপাট্য—রবীন্দ্রনাথে কারুকার্যবলয়িত বৈদগ্ধ্য—শরৎচন্দ্রে সবেগ সারল্য।

রবীন্দ্রনাথের অলঙ্কারিতার কথা আমি বলছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ অলঙ্কার স্থূল ভূষণ আদৌ নয়। দ্রাবিড়ী প্রসাধনের গুরুভার এখানে অণুমাত্র নাই—আধুনিক গহনার মত তা হালকা

পাতলা; সোনার তার পিটিয়ে অতি সরু করে তবে তা দিয়ে যেন বহুভঙ্গ লতাপাতা কাটা হয়েছে—এ কারুতা হল চারুতা। কারণ তার কাজ সূক্ষ্ম মিহি চিক্কণ, তাতে বাহ্য আড়ম্বর, স্থূল হস্তের অবলেপ নাই—অঙ্গে অঙ্গে তার রয়েছে সৌকুমার্য, বলয়িত লাস্য।

আজ বাংলা ভাষা নিত্য নূতন সৃষ্টির জন্য উন্মুখী উদ্যগ্র। অনেক নব সেবকের হাতে সে যে উন্মার্গগামী হয়ে পড়বে, তাও স্বাভাবিক। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উদাহরণটি সম্মুখে ও স্মরণে রাখা একান্ত প্রয়োজন—তাঁর অনুকরণ বা অনুসরণ করবার প্রবৃত্তি যদি না-ই থাকে। রবীন্দ্রনাথও বহু নবসৃষ্টি করেছেন—এমন-কি অতি-আধুনিক ধারাতেও নেমে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য ও শক্তি এইখানে যে তিনি কখনো যথাযোগ্যের, সুন্দরের সীমানা অতিক্রম করে যান নি—পরন্তু যেখানেই বা যত দূরই গিয়ে থাকুন সে সমস্ত সুন্দরেরই এলাকাভুক্ত করে নিয়েছেন। শ্রীহীনতা নিরর্থকতা তাঁর কোন প্রয়াসে এসে দেখা দেয় নি। নূতনের অভিনবের ধারায় চলে তিনি সর্বত্র সুন্দরের সৌষ্ঠবের সার্থকতারই প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। তাঁর অন্তরাত্মাকেই তিনি প্রকাশ করে ধরেছেন।

প্রবাসী, ১৩৪৩

দূরের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথে—তাঁর জীবনে, তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে, বিশেষভাবে তাঁর কাব্যে—রূপ নিয়েছে যে জিনিষটি তা হল আমরা যাকে বলি আস্পৃহা, অভীপ্সা—অন্তঃপুরুষের নিভৃত এক ঊর্ধ্বমুখী আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা। সাধারণের মোটা ভাষায় তাকে বলা যায় ভগবানের দিকে টান, দার্শনিকের পরিভাষায় তার নাম আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক—এই প্রাচীনতর নামরূপ বা সংজ্ঞার ছাঁচে তাঁকে হুবহু ঢালা যাবে না। ফলতঃ তাঁর চেতনার গুণবৈশিষ্ট্যই হল লক্ষ্যকে আদর্শকে গন্তব্যকে ইষ্টকে যথাসম্ভব অপরিচ্ছিন্ন অনির্বচনীয় করে রাখা। নির্দিষ্ট স্পষ্ট করে ধরা অর্থ সীমাবদ্ধ করা, স্থূল ও স্থাণু করে তোলা। তাই যে বস্তুর উপাসক পূজারী প্রেমিক তিনি তার নামকরণ করতে গিয়ে ভাষায় যে কথা যত ব্যাপক যত অবিশেষ ও অস্পষ্ট সেগুলি ব্যবহার করেছেন—অসীম, অনন্ত, অরূপ, অমূর্ত। ইষ্ট যদি মূর্ত হয়েই দেখা দিল তবে সাধকের সাধনারও সাঙ্গ হল, ইষ্টও আর ইষ্ট রইল না। কিন্তু আবার তাই বলে রবীন্দ্রনাথের ইষ্ট যে উপনিষদের—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং,

তা নয়। তাঁর কাম্য হল উপনিষদের আর এক উপলব্ধি

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব

কিম্বা—

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্

সেই পরম সত্যের কোনই রূপ নাই বলে যে তিনি অরূপ—তা নয়, তিনি অরূপ, কারণ তাঁর রূপের সীমা নাই, কোন বিশেষ রূপের মধ্যে এসে নিঃশেষে ধরা দেন না। তিনি কেবল অসীম অনন্ত নন, তিনি হলেন আনন্দং অমৃতং, তিনি হলেন প্রেয়। সেই প্রিয় রয়েছেন সকল রূপের আড়ালে, রূপের ভিতর দিয়ে কখনো দেখা যায় কি না-যায় বলা যায় না—এই রকমেই তিনি মানব-আত্মাকে নিরন্তর তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে চলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইষ্টকে চাক্ষুষ দেখেন নাই—নির্নিমেষ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেন নাই, করতে চান নাই—তাকে দূরে রেখে, আড়াল করে, তাকে অজস্র ভঙ্গিমায় নামে রূপে রঙে ছন্দে আভাষে ইঙ্গিতে কুহেলীময় রহস্যময় করে তুলেই তাঁর আনন্দ ও সার্থকতা। সে-বস্তু অনন্ত অসীম আরও এই জন্য যে, তা অজানা-অচেনা, অথবা প্রায় অজানা-অচেনা—কাছে থেকেও দূরে, দূরে থেকেও কাছে—তদ্দূরে তদন্তিকে"। তাই ত সে হল যেন অপরিচিতা বিদেশিনী কৌতুকময়ী ছলনাময়ী। পরমপ্রীতির আস্পদ হলেও, একটা নিরন্তর বিচ্ছেদই সেই প্রীতিকে গাঢ় তীব্রমধুর উছল উদ্বেল করে ধরেছে। দূর সুদূরের জন্য এই যে চির বিরহজ একটা আকূতি পাশ্চাত্য কবি শেলীকে আকুল করে তুলেছিল, তাঁর Skylark ছিল এই আকূতির জীবন্ত বিগ্রহ। শেলীর প্রেমাস্পদও এই রকম অতিদূরের অভীষ্ট—

The desire of the moth for the Star
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar—

এ কথা রবীন্দ্রনাথেরও মর্মকথা। রবীন্দ্রনাথকে যে এক সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতেরা বাংলার শেলী বলতেন, তার হেতু, এই দিক দিয়ে উভয়ের একটা সাদৃশ্য।

পাশ্চাত্যের ধর্ম-ইতিহাসে এই আধ্যাত্মিক আকূতি বা আস্পৃহার নাম দেওয়া হয়েছিল Quest—সন্ধান। Holy Grail-এর সন্ধানে খৃষ্টীয় নাইট(Knight)দের অভিযান, এই রূপক কথা এক সময়ে ইউরোপীয় চিত্তকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করে ধরেছিল—শিল্পে সাহিত্যে তার পরিচয় অনেক রয়ে গেছে। আমি পাশ্চাত্যের অবতারণা করছি এই জন্য যে রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনায় ঔপনিষদ সুর যতখানি রয়েছে, পাশ্চাত্যের সুরও তার অপেক্ষা কম নাই—অনেক সময়েই দেখি ভিতরের অস্থিমজ্জাকে, আন্তর সত্তাকে যদি এনে দিয়ে থাকে বেদান্ত, রক্তমাংস এসেছে ইউরোপ হতে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই উভয়ের সংমিশ্রণ এক অপরূপ রসায়ন (alchemy)।

সে যা হোক, আস্পৃহার অনুসন্ধিৎসার অভিযান-অভিসারের যে বৈশিষ্ট্য আমরা উল্লেখ করেছি তার হতে রবীন্দ্রনাথের চিত্তধারায়—সুতরাং তাঁর কাব্যরীতিতে দুটি গুণ দেখা দিয়েছে। প্রথমত, গতি-বেগ, ছন্দের দোল, সুরের মূর্ছনা। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হতে সুরু করে 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে' আর 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' দিয়ে বলাকার 'পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল' অবধি একই ভঙ্গি 'বিলোল-হিল্লোল' হয়ে চলেছে। অন্তঃপুরুষের, হৃদগত চেতনার একটা নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির জন্য অধীরতা, প্রতিনিয়ত আরো বেশি, আরো দূরে, আরো ঊর্ধ্বে এগিয়ে চলা, অন্তঃস্থ ভাগবত-অগ্নিশিখার এই হল ধর্ম। তাই ত পথচলার আনন্দ, আশ্রয়ে কোথাও আবদ্ধ থাকা নয়,

নিরন্তর চলা—চলার জন্য চলা মানুষের ও জগতের ব্রত ও জীবন-সাধনা হয়ে ওঠে। বৈদিক মন্ত্র—চরৈবেতি—রবীন্দ্রনাথের তাই এত প্রিয় মন্ত্র। লক্ষ্য বলে একটা বিশিষ্ট স্থির বস্তু কিছু আছে কি? আজ যা লক্ষ্য কাল তা পার হয়ে যাই, আর-এক লক্ষ্য সম্মুখে ফুটে ওঠে, আজকার উত্তুঙ্গ শিখর কাল পদতলে, তার পিছনে ভেসে ওঠে উত্তুঙ্গতর শিখর, তার পিছনে আরও উত্তুঙ্গতর, এই রকমে অনন্ত শ্রেণী চলেছে। দাঁড়াবার, ইতি বলে বসে পড়বার উপায় নাই। কবির প্রাণের কথা তাই—

সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ—

কিম্বা

ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন···

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

আরও

জীবন পথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহ নমস্কার—

রবীন্দ্রনাথে এই গতিময়তার দিকটি খুবই স্পষ্ট—কেউ কেউ এই সম্পর্কে বের্গসনের কথা উল্লেখ করেছেন। উভয়ে-সাদৃশ্য অনেক

আছে, কিন্তু পার্থক্যও মূলগত মর্মগতই বলে আমার মনে হয় বের্গসনের গতিময়তা হল চরম, একমাত্র, আদি সত্য—তা অহেতুক গতিময়তা আর তাতে অন্য গুণ আছে কি না সন্দেহ। এই অহেতুক গতিময়তার মধ্যে একটা বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যেতে পারে বটে কিন্তু গতিধর্মের সেটি গৌণ লক্ষণ। এ গতির মধ্যে উদ্দেশ্য কিছু নাই—উদ্দেশ্য যদি থাকে তবে গতি হারিয়ে বসে তার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের সন্তান—সম্মুখের গতিশীলতা নিয়ে যতই তিনি মাতোয়ারা হয়ে উঠুন না, পশ্চাতে কোথাও রয়েছে ঔপনিষদ একটা নীড়স্থ স্থিতি: তাঁর চলা যতই চলার জন্য চলা হোক না, তিনি জানেন সকলের পারে অন্তিমে রয়েছে—

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি

ধীর গম্ভীর গভীর মৌন মহিমা।

রবীন্দ্রনাথে গতি একান্ত উদ্দেশ্য-হারা নয়, অন্ধ নয়—তা জ্যোতির্মুখী, জ্যোতির্ময়—

আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

আবার

অমর পুষ্প তব
আলোক-পানে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্য নব।

এ গতি হল, আমরা বলেছি, মূলতঃ একটা আধ্যাত্মিক অভীপ্সা, ভগবৎমুখী ব্যাকুলতা—এখানে আছে শ্রী, এখানে আছে হ্রী—তা উজ্জ্বল, তা মধুর, প্রগাঢ় প্রখর, আবার শালীন ও স্বচ্ছ। বের্গসনের élan vital প্রধানতঃ প্রাকৃত প্রাণজ গতিবেগ—শেষের দিকে খৃষ্টীয় ভাবের প্রলেপ দিয়ে তাকে যতই আধ্যাত্মিক পদবাচ্য করে তুলতে চেষ্টা করুন না।

তবে এ ঠিক যে গতিময়তাই দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য। যে প্রশান্তি ও নীরবতার কথা তিনি মাঝে মাঝে বলেছেন তা রয়েছে ভিতরের প্রচ্ছন্ন চেতনায় আশ্রয় হিসাবে কিম্বা দূরের আশা ও প্রত্যাশা হিসাবে—ছন্দের অন্তরে যেমন যতি, সুরের অন্তিমে যেমন সম। এই সুরও রবীন্দ্রনাথের গতিময়তার আর-এক নাম। সুর ধ্বনি মূর্চ্ছনা গতির স্বাভাবিক প্রকাশ—

যে চলে সেই গান গেঁয়ে যায়
সব-পেয়েছির দেশে।

কিম্বা

দূর হতে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে—

নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ প্রায়। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দিক দিয়েও দেখি—যেখান হতে উদ্ভূত আস্পৃহা সেখান হতেই উদ্ভূত আহ্বান—হৃদ্‌গত অনাহত বাণী সেও অভীপ্সার ঊর্ধ্বায়িত আত্মপ্রকাশ ও আত্মঘোষণা—

আমার অনাগত,
আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে
বাজিছে তারা।

স্মরণ করুন এই সঙ্গে শেলীর—

And singing still dost soar and soaring ever singest—

রবীন্দ্রনাথকে আমরা গানের রাজা বলে জানি। গানের গীতিকাব্যের ভিতর দিয়েই তাঁর কবিচিত্তের সহজ স্বরূপ প্রকাশ হয়েছে।

যথাসম্ভব অনির্দেশ্যের অভিমুখে যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ স্বৈর গতি রবীন্দ্রনাথে দ্বিতীয় যে গুণটি এনে দিয়েছে, তার কথা এখন বলি—গুণটিকে এক সময়ে খুবই দোষ বলে অনেকে ঘোষণা করেছিলেন। এক দল তার নাম দিয়েছিলেন অস্পষ্টতা, আর-এক দল তার নাম দিয়েছিলেন বস্তুতন্ত্রের অভাব। শুনুন না 'সোনার তরী'—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধার খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।—

সুন্দর ভাষা, সুন্দর ছন্দ, সুন্দর ছবি মনোহর নেশায় মন-প্রাণকে আপ্লুত করে—কিন্তু সার পদার্থ কি আছে, কোন্ প্রত্যক্ষ জাগ্রত উপলব্ধি মূর্ত হয়েছে এখানে? একটা কিছু উপলব্ধির প্রয়াস আছে

ঘটে, কিন্তু কিছুই দানা বাঁধে নাই—সবই গলে তরল হয়ে চলেছে, বাষ্প হয়ে প্রায় উবে যায়। এই ক্লাসিকপন্থী সমালোচকেরা তাই বলতেন রবীন্দ্রনাথের হল কল্পনার খেয়ালের খোস-মেজাজের ছায়াবাজী মায়ারচনা—তাতে সত্যদ্রষ্টার স্পষ্ট পরিচ্ছিন্ন দ্বিধাহীন নিশ্চয়তা নাই—বৈদিক ঋষির মত রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না 'জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে'—সূর্যের দিকে চোখ খুলে অনিমেষ যেন চেয়ে থাকতে পারি। এ কথা কতকটা হয়ত ঠিক যে বিশ্বসাহিত্যে কবিহিসাবে যাঁরা একেবারে সকলের উপরে স্থান পেয়েছেন তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করলে পার্থক্য দেখা যায় এই যে, তাঁদের সৃষ্টিতে বাক্য আর বস্তু এ দুটির মধ্যে রয়েছে যথাসম্ভব নিখুঁৎ সামঞ্জস্য ও সাম্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে মোটের উপর দেখি বাক্যের ভাগ যেন বস্তুর অপেক্ষা কিছু বেশি, আর এই জন্য মনে হয় কবিত্বের ওজন যেন একটু কম—তাঁরই কথার ও রীতির অনুসরণে বলা যেতে পারে, পরিপূর্ণতার মধ্যেও এখানে রয়েছে একটা অপূর্ণতা। অবশ্য বস্তু অর্থে কেবল অর্থসম্পদ বা বিষয়গরিমা নয়—বস্তু অর্থে ভিতরের সার পদার্থ, সৎবস্তু, চেতনায় সংগৃহীত সঞ্জীবিত এক রসময় সত্য। তবে বলা যেতে পারে, এও হল সৃষ্টির একটা বিশেষ রীতির বিধান—রবীন্দ্রনাথ অনুসরণ করেছেন আর-এক বিধান। একটি উদাহরণ এখানে নিতে পারা যায়। মাইকেল এঞ্জেলো ভাস্কর-হিসেবে শিল্পী-শ্রেষ্ঠদের শীর্ষদেশে। তাঁর তক্ষণের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে মূর্তিখানি তিনি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করতেন না, খানিকটা অসম্পূর্ণ রেখে দিতেন, আনকোরা পাথরটা এখান দিয়ে ওখান দিয়ে কিছু জেগে থাকত। হয়ত তিনি এই উপায়ে ইঙ্গিত করছেন যে মূর্তিটি

বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে, তা মূর্তি মাত্র নয়—গ্রীকদের আদর্শ যে নিখুঁৎ নিটোল সর্বাঙ্গসুষ্ঠু, নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ ও সার্থক একটা বিচ্ছিন্ন রচনা মাত্র, সে রকম নয়। আমাদের দেশে গোটা পাহাড়ের গায়ে খানিকটা কেটে মূর্তি বা গুহামন্দির গড়ে তোলা একটা রীতি ছিল, তারও অর্থ ছিল আর্ট ও প্রকৃতির অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করা—আর্টকে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে ধরা। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও অনুরূপ একটা সাফাই দেওয়া যেতে পারে। সার বস্তুর মধ্যে একটা তারল্য, লঘুভার,—তনুর তানিমা—ঋজুতার পরিবর্তে একটা তির্যক্ ও বলয়িত গতি ফুটে উঠেছে মূল প্রেরণার, চেতনার ধর্মের চাপে ও প্রয়োজনে। আর তা হল, আমরা যে বলেছি, একটা চির সচল, নিরন্তর ঊর্ধ্বায়মান আস্পৃহার আবেগ—দূর সুদূরের পিপাসা—অন্তঃপুরুষের অনির্বাণ অগ্নিশিখা, নিত্যপ্রসরমাণ জ্যোতির্লেখা। এই যে অন্তরের অন্তহীন সীমাহীন অবাধ অবিশেষ আকৃতি, এই যে নিরুদ্দেশ যাত্রা, ঐ যে

পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে—

কিম্বা

হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে—

কবি তাকে নিবিড় জীবন্ত করবার জন্যই, তার স্বধর্মকে অনুভবগম্য করে ধরবার জন্যই তাকে একটা স্পষ্ট মূর্ত উপলব্ধির মধ্যে পরিচ্ছিন্ন

করে ধরেন নাই। উপলব্ধি অর্থ মিলন—কবি মিলনকে চান নাই। কবির মর্মবাণী—

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।—

সেণ্ট্ অগস্টাইনের একটি কথা আছে, নিজের অন্তর্জীবনের এক অবস্থা সম্বন্ধে বলছেন, তখন তিনি ভালবাসতে সুরু করেন নাই—তবে ভালবাসাকে ভালবাসতে সুরু করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্তের বড় অনুরূপ একটা ভাবে বঞ্জিত।

রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে চেতনার এই মূল সুর ও ঐক্যসূত্র—এই একই জিনিষ—আস্পৃহার চির-সচল ঊর্ধ্বমুখী গতি—বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন বয়সে—কি রকমে বিভিন্ন ভাবে ও ভঙ্গীতে, নামে রূপে ব্যক্ত হয়েছে, তা এক চিত্তাকর্ষক প্রসঙ্গ। তার মোটামুটি একটা নির্দেশ আমরা দিতে পারি। আরম্ভ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' দিয়ে—

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল্ খল্, গেয়ে কল কল্
তালে তালে দিব তালি।

এখানে আকূতির প্রথম জাগরণ—সে তরুণ কিশোর, চপল উছল,

হাস্যলাস্যমুখর, বাহ্যদৃষ্টিপ্রধান, স্থূলকর্মব্রতী। তারুণ্যের উদ্বেল উৎসাহ মূর্ত এখানে। তারপর ধরুন 'সোনার তরী', আর-এক ভাব, আর-এক অবস্থা—

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে !
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা-পালে চ'লে যায় কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু'ধারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

চেতনা অন্তর্মুখী হয়েছে, যৌবনের প্রথম বিরহের স্বাদ প্রাণে লেগেছে—মধুর, তীব্র, করুণ। আস্ফোট আড়ম্বর নাই, আছে একটা নিবিড় মর্মস্পর্শী মূর্ছনা; একতারার তীব্র আহ্বান—অনুভব গাঢ়, আন্তরিকতায় সহজ, স্বচ্ছন্দ। সেই সঙ্গে ক্রমে জেগেছে একটা কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা—তাতে জীবনরহস্য আরও রহস্যময় ও রসময়ই হয়ে উঠেছে।

তারপর আর একটু আগে 'পরশ পাথরে' শুনি—

পুরাতন দীর্ঘপথ পড়ে আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কতদূর নাহি তার শেষ।
দিক হতে দিগন্তরে মরুবালি ধূধূ করে
আসন্ন রজনী-ছায়ে ম্লান সর্বদেশ।

একেই খৃষ্টীয় সাধুরা বলতেন না কি dark night of the soul ? পুরাতনকে ছেড়ে এসেছি, নূতনকে পাই নি—নূতনের আস্বাদ

পেয়েছি কিন্তু তাও কখন হারিয়ে গেছে—পুরাতনে ফিরবার উপায় নাই, নূতনের পথ জানি না—একটা অসহায় ব্যাকুলতা গুমরে উঠেছে। তবে আমাদের কবিব রাত্রি খৃষ্টান সাধুদের রাত্রির মত ততখানি অন্ধকার কখনই নয়। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় একই সুর—'আঁধার রজনী'র কথা, কিন্তু তার মধ্যে সেই 'পলাতকা'র নীরব হাসি ঝিকিমিকি ফুটে উঠেছে,—কবি বলতে পারছেন তারই মধ্যে

শুধু ভাসে তব দেহ-সৌরভ,

গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব
কেশের রাশি—

রবীন্দ্রনাথে বেদনা কখন একান্ত, কখন ট্রাজিক হয়ে ওঠে নি—কারণ তাঁর বিরহের মধ্যে মিলন প্রচ্ছন্ন রয়েছে—মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান—মৃত্যু মৃত্যু নয়, তার মধ্যে লুক্কায়িত অমৃতত্ব। যার অনুসরণে কবি নিরন্তর চলেছেন তার একটা সন্ধান সর্বদাই তাঁর মিলেছে। এই আকূতির চরমোৎকর্ষ, তার পূর্ণ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে উর্বশীর মধ্যে। কবি এখানে তাঁর প্রাণের যাবতীয় তন্ত্রী টেনে বেঁধেছেন তাঁর অন্তশ্চেতনার যথাসম্ভব উচ্চ গ্রামে—অনুভব যেমন নিবিড়, ভাষা তেমনি গাঢ়বদ্ধ, ছন্দ তেমনি মহত্বপূর্ণ। তাঁর কবিত্বে খাঁটি মহাকাব্যের ওজন এই একবার অন্ততঃ দেখা দিয়েছে। কবির কণ্ঠে এপিক গরিমা ফুটে উঠেছে।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশী!
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা!
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে!

এর পরের যুগে কবির পরিণত প্রৌঢ় চেতনার অবস্থায়—'খেয়া'র যুগে—কবি একটা সহজ সাধারণ ঘরোয়া বা নিত্যনৈমিত্তিকের সুরে চলন-বলনে নেমে এসেছেন। বসনভূষণের আতিশয্য খসে গিয়েছে, আটপৌরে সহজশ্রী—বসন্তের ঐশ্বর্য নয়, শরতের শালীনতাই এখন যথেষ্ট হয়েছে—এখনকার আস্পৃহা যেন বাউলের একতারায় মেঠো ও মিঠে সুর—

ওপারেতে সোনার কূলে আঁধার মূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো-গান—

'গীতাঞ্জলি'র ও 'গীতালি'র বেশির ভাগে এই সুরই প্রাধান্য পেয়েছে। এর পরে কবির কণ্ঠ আর-একবার উদাত্ত আবেগে ঝঙ্কৃত হয়েছে—সুর উঠেছে উচ্চতর পর্দায়, তান পেয়েছে দীর্ঘতর প্রসার, গতির মধ্যে চাঞ্চল্য অপেক্ষা এসেছে দৃঢ়তা, তারল্যের চূর্ণধর্মী নয়, ঘনীভূত

ভাবের দুর্দমনীয় টান, গভীরের দোল—আমি বলছি 'বলাকা'র কথা—

শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা,
মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে—

আমার মনে হয় না রবীন্দ্রনাথ আবার কখন এই পর্দায়, এতখানি তানবিস্তারে তাঁর বাণীকে মূর্তিমতী করেছেন। রকমারি প্রাচুর্য, বহুধা বৈচিত্র্য অনেক এসেছে—তাদের সকলের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সৌন্দর্য রয়েছে, সৌষ্ঠব রয়েছে কিন্তু এতখানি মহত্ত্ব ও ঔদার্য আছে কি না সন্দেহ। এখানে যে গতির আবেগ ব্যক্ত হয়েছে তা কেবল মানুষের বা জীবের আস্পৃহার কথা নয়—জড়

মাটির, মূক পৃথিবীর নিজের আস্পৃহা অপরূপ গাঢ়-কণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে,—কেবল সচেতন সত্তা নয়, অবচেতন সত্তার মধ্যেও স্পন্দিত এক নিবিড় অধীর ঊর্ধ্বমুখী আবেগ, সমগ্র সৃষ্টির একেবারে তলা থেকে সমগ্র আধার বেয়ে উঠে চলেছে এক অতন্দ্র আলো-অভিসার—এ কথাটি কেবল সুষ্ঠু করে যে বলা হয়েছে তা নয়, তাকে মূর্ত করা হয়েছে বাক্যে ও ছন্দে, তার সজীব বিগ্রহ যেন এখানে পেয়েছি। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' এ বার্তার প্রথম কাকলি ফুটে উঠেছে—যদিও নির্ঝর সেখানে একটা প্রতীক বা উপমা মাত্র, একটা কেবল আশ্রয় ও অবলম্বন—আর ভিতরের ভাবও অনেকখানি ঔপদেশিক ও প্রচারধর্মী—তা হলেও মূলত স্বপ্ন একই—তাই বলতে পারি নির্ঝর দিয়ে যা আরম্ভ—একটি তন্ত্রীর স্বরমূর্ছনা, একটি অঙ্গের আবাহন—বলাকা দিয়ে সর্বাঙ্গের সমবেত ঐকতানে তার পরিণতি—the wheel came full circle—একটা চেতনা-চক্রের এইভাবে পূর্ণাবর্তন হয়েছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার ধারা

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, তাঁর চিত্তের ও চেতনার গড়নে, তিনটি কি চারটি ধারা প্রবহমাণ ; এ কয়েকটি মিলে মিশে তাঁর কবি-স্বভাবের, তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য গড়ে দিয়েছে। ধারা ক'টি হল—প্রথম, উপনিষদের ধারা ; দ্বিতীয়, বৈষ্ণব-ভাবের ধারা ; তৃতীয়, 'পেগান' (Pagan) অর্থাৎ বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্যভোগের ধারা ; আর চতুর্থ যোগ করা যেতে পারে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বা যুক্তিবাদের ধারা।

আমরা মনস্তাত্ত্বিকদের ভাষা ধার করে বলতে পারি ঔপনিষদ-ভাব রবীন্দ্রনাথের ঊর্ধ্বতর বুদ্ধিকে ভাস্বর করেছে, বৈষ্ণব-ভাব তাঁর হৃদয়কে (ঊর্ধ্বতর প্রাণকে) সরস ও বিদগ্ধ করেছে, সৌন্দর্য-প্রিয়তা তাঁর নিম্নতর প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে অপরূপ মোহিনী শক্তিতে ভরে দিয়েছে। আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বাহ্যমানসসত্তাকে, মস্তিষ্কের পরিধিকে পরিপূর্ণ করে সকলকে ঘিরে— অনেক সময়ে সূক্ষ্মভাবে— একটা ব্যাপক আবহাওয়া রচে দিয়েছে। তবে এই সংমিশ্রণ বা যোগাযোগের ফলে কোনো ধারাটিই তার স্বকীয় বিশুদ্ধ স্বরূপ বজায় রাখতে পারে নি— প্রত্যেকে একটা নূতনত্ব অর্জন করেছে, সকলের উপর পড়েছে একটা রাবীন্দ্রিক ছাপ।

প্রথম ঔপনিষদ ধারা—

শোনো বিশ্বজন—
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ[১]
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময় ; তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি'
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।

অনুবাদ হলেও, এ মন্ত্র রবীন্দ্র-চেতনার কাঠামোটি দিয়েছে। নিজের ভাষায় ও ভঙ্গীতেও তিনি বলছেন—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে—

এর সঙ্গে স্মরণ করুন উপনিষদের 'সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং'। তবে অবশ্য সিদ্ধান্তের দিক দিয়ে ততখানি না হোক, কান পেতে শুনলে সুরের পার্থক্য ইতিমধ্যেই আমরা কিছু ধরতে পারি। আরো শুনুন—

নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ়গুহা হতে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সঙ্গীত তোমার—

---

১ রবীন্দ্রনাথ এখানে উপনিষদের মূল একটু পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। মূলে দেবগণ নয় মানুষকেই অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করা হয়েছে।

ঔপনিষদ অনুভূতি এখানে পিছনে সরে চলেছে, সম্মুখে আসছে দ্বিতীয় ধারার দোল। আরো আগে চলুন—

শেষের মধ্যে অশেষ আছে···
সবার চেয়ে বড় যে গান সে রয় বহুদূরে-

কিম্বা

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর—

এখানে জাগছে এই ঔপনিষদ কথার স্মৃতি—

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতং।

আবার যখন শুনি—

সত্য মুদে আছে
দ্বিধার মাঝখানে
মৃত্যু ভেদ করি
অমৃত পড়ে ঝরি

তখন স্বতঃই আমাদের মনে এসে যায়—

অসতো মা সৎ গময়·····
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়—

অথবা এই আর-এক মন্ত্র।

কথা তারে শেষ করে
পারে নাই বাঁধিতে
গান তারে সুর দিয়ে
পারে নাই সাধিতে—

এর পিছনে রয়েছে যে প্রাচীনতর মন্ত্র তা হল এই—

অবাঙ্‌মনসগোচরং

কিম্বা

যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে—

আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের নিভৃতচেতনা কতখানি ঔপনিষদ ভাবে ওতপ্রোত ছিল সে কথা বুঝবার জন্যে। শুনুন—

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই,
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল—

অথবা

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।

এ আধুনিক অনুভবের বৈদান্তিক উৎস হল

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি—

তবে পার্থক্যের বা বৈষম্যের কথা যে উল্লেখ করেছি তাও এখন বুঝতে পারি। উপনিষদের হল জ্ঞানঘন স্থিরবিদ্যুৎসম উপলব্ধি, আর রবীন্দ্রনাথের হল অনুভূতি বা অনুভব, তা প্রাণাবেগে ভাব-বৈদগ্ধ্যে সচল চঞ্চল উদ্বেল জটিল—একদিকে তার মধ্যে এসেছে হৃদয়ের প্রাণের প্রবেগ, অন্যদিকে রয়েছে মন-বুদ্ধির চিন্তাচাতুর্য। উপনিষদের

উপলব্ধি সাক্ষাৎদৃষ্টি—তার অন্য নামই হল 'সাক্ষাৎকার'—ঐ উভয় ধরণের মিশ্রণ হতে মুক্ত ছিল। তাই হৃদয়ের ভাববিলাস রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদের মত ততখানি জ্যোতিষ্মান নির্মুক্ত জ্ঞানের নয় যতখানি প্রেমের অনুরাগের মধুরতার ছবি করে তুলেছে—

বন্ধু হয়ে পিতা হয়ে জননী হয়ে
আপনি তুমি ছোট হয়ে এস হৃদয়ে।

উপনিষদেও আছে 'পিতা নোঽসি'—কিন্তু উপনিষদকার জানেন এ হল একটা বলার ধরণ; কারণ আসল সত্য ত

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ

কিম্বা

ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি
আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রাণ নিংড়ে যেন ঝরছে এই বাণী

ঐ শোনো গো অতিথ্ বুঝি আজ,
এল আজ।
ওগো বধু, রাখো তোমার কাজ,
রাখো কাজ—

অথবা

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর
তোমার প্রেম তোমারে এমন করে
করেছে নিষ্ঠুর—

আর এই হল রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব-ভাব; কিন্তু এই সাধারণ বৈষ্ণব-ভাবও শেষে মনে হয় যেন কবির পক্ষে যথেষ্ট সরস বিদগ্ধ, যথেষ্ট সহজ অন্তরঙ্গ আবেশভরা বাঁধনহারা হয় নাই, তাই বৈষ্ণব-ভাবকে পিছনে ফেলে তিনি সরে চলে এসেছেন বাউল-ভাবের মধ্যে—

সহজ হবি সহজ হবি
ওরে মন সহজ হবি
কাছের জিনিষ দূরে রেখে
তার থেকে তুই দূরে রবি—

কিম্বা

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী—

তবে এখানে নির্দেশ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব-ভাবও গোঁড়া বৈষ্ণব-ভাব নয়। প্রথম কথা, বৈষ্ণব-ভাবের মর্ম হল ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে একটা একান্ত ব্যক্তিগত ভাবস্থিরতার রসময়তার সম্বন্ধ—ভক্তের চেতনায়, দৃষ্টিতে ভগবানের প্রেমময়-মূর্তিটি ছাড়া আর কিছু নাই—বিশ্ব হারিয়ে গেছে, লোপ পেয়েছে—ভগবানের আর কোন আকাঙ্ক্ষা রূপের সংবাদ তিনি রাখেন না। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এতখানি আত্মভোলা হয়ে ওঠা সম্ভব হয় নাই, এতখানি মূর্তিপূজারী অর্থাৎ ব্যক্তিরূপী-মূর্তি-পূজারীও হতে পারেন নাই। খাঁটি বৈষ্ণবের যে 'অব্যভিচারী অনন্যমুখী একরসসার তন্ময়তা তা ঠিক

রবীন্দ্রনাথে নাই। ভগবানের মধুর মূর্ত (মানুষ) রূপটি অপেক্ষা প্রভুরূপ ঈশ্বর-রূপটি তাঁর চিত্তকে বেশি দোলা দিয়েছে—এদিক দিয়ে তাঁর সাদৃশ্য বেশি বোধ হয় খৃষ্টীয় কিম্বা মোসলেম সাধকদের সাথে, তাঁরা ভগবানের বা ঈশ্বরের মহিমাকীর্তনে বেশি আনন্দ লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথে প্রেমের প্রবাহ প্রাণের ঠাকুরের কাছে গিয়েছে বটে কিন্তু এ প্রাণের ঠাকুর প্রধানতঃ ঐশ্বর্যময়, সে প্রবাহ ব্যক্তি থেকে বিশ্বে, পুরুষ ছেড়ে প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছে; বৈষ্ণবের মানুষরূপী ভগবান তাঁর সাধ্য বা ইষ্ট নয়, আবার নিরাকার নির্গুণ পুরুষকেও তিনি একান্ত গ্রহণ করতে পারেন নাই—তিনি করেছেন নির্গুণ বা নিরাকার পুরুষের উপর প্রেমরূপ আরোপ—তাঁর ভগবান পুরুষ যদি হয় তবে তা ব্যক্তিপুরুষ নয়, বিশ্বপুরুষ। ভগবানের নাম করতে, ভগবানের চিন্তা করতে সর্বদা প্রকৃতিকে তাই তিনি আহ্বান করেছেন।

আছ অনলে অনিলে চির নভোনীলে
ভূধরে সলিলে গহনে

অতি পরিচিত জিনিষ। এর হেতু তাঁর চেতনায় আর-একটি সুরের—তাঁর যে 'পেগান'-প্রকৃতি তার প্রভাব। বৈষ্ণব কবির মন্ত্র—

হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল—

এখানে রয়েছে দুটি চিত্তের একান্ত অন্যোন্যাশ্রয়ী সংযোগ ও সম্মেলন, এ হল রসঘন 'কেবল' সম্বন্ধ। বৈষ্ণব কবি বলতে পারেন বটে—

গগনে অব ঘন মেঘ দারুণ
সঘন দামিনী ঝলকই
কুলিশপাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই—

কিম্বা

প্রদীপ জারি থারি পর রাখই
আরতি করতহি গাওত গীত—
ঝলকত ও মুখচন্দ।

কিন্তু স্পষ্টই আমরা দেখি এখানে বহির্মুখী দৃষ্টি অন্তরের তন্ময়তায় ভরপুর। প্রকৃতি বা বাহ্য-পরিবেশের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে, চিত্রণ করা হয়েছে অন্তরকে আরো গাঢ় আরো অন্তরমুখী করে ধরবার জন্য—তাদের নিজস্ব মূল্য বা সার্থকতা ত নাই, স্থানও গৌণ, স্বভাবও রূপান্তরিত, এমনভাবে আত্মসাৎ করা হয়েছে যে যেন তা অন্তঃকরণেরই অন্তর্গত হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথে প্রকৃতি সর্বদাই পেয়েছে একটা স্বাধীন সত্তা, স্বকীয় মাহাত্ম্য—রেখেছে তার স্বাভাবিক ধর্ম; তার মধ্যে অন্তরের ভাব প্রসারিত বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে, প্রায়শঃ হারিয়ে গেছে। তাই বুঝি কবি সহ্য করতে পারেন নি যে বৈষ্ণবের গান হবে কেবল বৈকুণ্ঠের জন্য। তা নয়; সমস্ত পৃথিবী, সকল জগৎ ও মানুষ থাকবে আমার চার দিকে, ভাগ নেবে আমার আনন্দে, আমার সুখে, দুঃখে—এ ভাবে বাহিরকে বহুকে যতক্ষণ পর্যন্ত ডেকে সাক্ষীরূপে না খাড়া করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত যেন নিজের অনুভব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ বা সুদৃঢ়

হতে পারছি না। বৈষ্ণব কবি সর্বতোভাবে আত্মহারা, এতখানি সজ্ঞান মন— নিজের সম্বন্ধে হোক আর জগতের সম্পর্কে হোক।

তারপর দ্বিতীয় পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব-ভাবে 'আত্ম'-জ্ঞান, আমি-বোধ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে এবং বলতে হবে, মূলতঃ তা অবৈষ্ণব। বৈষ্ণব-ভাবের সার নতি, প্রপত্তি। রবীন্দ্রনাথে সে জিনিষ কি তাব বহু উল্লেখ আছে—তাঁর সজাগ মন তা ভুলতে পারে না—

আমাব মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে—

কিম্বা

আমার আমি ধুয়ে মুছে
তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে।

আরো

তুমি আমার অনুভাবে
কোথাও নাহি বাধা পাবে
পূর্ণ একা দেবে দেখা।

কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর চেতনায় এন্থ বাহ্য। তিনি স্বীকার করছেন বটে যে ভগবান ছাড়া আমি নাই, কিন্তু তার চেয়ে গভীরতর রহস্যকর সত্য হল, আমি ছাড়া ভগবান নাই। কি রকম? চেতনার প্রথম স্তর, আরম্ভ বটে প্রণতি প্রপত্তি—তার উদ্দেশ্য কি, অর্থ কি, সার্থকতা কি? না, এই—

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাই ত আমি এসেছি এই ভবে…
মরে গিয়ে বাঁচব আমি, তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে—

এ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বৈষ্ণবলীলাবাদ সম্মত। কিন্তু তার পরে—

আমি এলেম তাই ত তুমি এলে
আমার মুখ চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে…
আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল
নইলে ত এই সূর্য তারা সকলি নিষ্ফল—

কিম্বা—

তোমার খুশি চেয়ে আছে
আমার খুশির আশে—

সত্যকার বৈষ্ণব-ভাবের সীমানা প্রায় কেটে যায়। আমি ভগবানের জন্য যেমন আকুলি-বিকুলি করি, ভগবানও করেন আমার জন্য—এই যে একান্ত মানবীয় ভাবের আরোপ (Anthropomorphism), এ আমাদের প্রাকৃত মনোবৃত্তিকে তৃপ্ত করবার কৌশল মাত্র। বৈষ্ণব-সাধক, এমন-কি সহজ-সাধকও এ কথা বলতে ইতস্তত করবেন। অহং-এর এ জাতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক যৌক্তিকতা হল আধুনিক মনোভাবের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সত্যকার বৈষ্ণব বলছেন বটে—

হামার গরব তুহুঁ বঢ়ায়ল

কিন্তু এর সুর ও ঠাট সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যষ্টিমহত্ত্ব আধুনিক চেতনার অপরিহার্য অঙ্গ—, তার মর্মকোষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমি ব্রাউনিংএর কথা পরে বলেছি—ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথের দর্শনে ও উপলব্ধিতে এ বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য ও সাধর্ম্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথে এ উপাদানটি তার পূর্ণ মর্যাদা পেয়েছে; তবে তার রূঢ়তাকে, কঠোরতাকে, আতিশয্যকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাব-বৈদগ্ধ্যে, চিন্তাচাতুর্যে, কবিত্বের ইন্দ্রজালে শোভন

সুন্দর হৃদিরঞ্জন নন্দনফুলহার

করে তুলেছেন।

ঔপনিষদ তত্ত্ব হোক, বৈষ্ণব রসবিলাস হোক, এদের চেয়ে বেশি আমার মনে হয় রবীন্দ্র-চিত্তকে অধিকার করে আচ্ছন্ন করে রয়েছে প্রকৃতি-প্রেম—আমি বলতে যাচ্ছিলেম পৃথিবীর জলের ভাগের মত এই অঙ্গটি রবীন্দ্র-সত্তার তিন-চতুর্থাংশ। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের উন্মেষ ও উন্মীলনে প্রকৃতির স্পর্শই যে মূল হেতু বা নিমিত্ত ছিল তা তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই মন্ত্রের ছন্দ ও চিত্র তাঁর শিশুপ্রাণকে দোলা দিয়েছে আশ্চর্য রকমে, তার পরে তাঁর কিশোর মনকে রসায়িত করেছে জয়দেবের 'নিভৃতনিকুঞ্জ-গৃহং'—তাঁর সত্তা সেই একই ধারায় চলে বর্ধিত হয়ে উপভোগ করেছে কালিদাসের 'মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃকম্পিত-দেবদারুঃ'। আমি রবীন্দ্রনাথের এ দিকটির 'পেগান' বিশেষণ দিয়েছি; তার কারণ প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর যে সংযোগ সেটি যতখানি শরীরগত, ইন্দ্রিয়জ হতে পারে, তাই। আদর্শের অধ্যাত্মের মিশ্রণ—প্রলেপ

কিম্বা প্রসাধন, অলঙ্কার, বাহার, পর্যন্ত বলা যেতে পারে—ঐ ক্ষেত্রটিতে যতই থাক, আসল অনুভবটি হল অমিশ্র আনকোরা প্রকৃতির, প্রকৃতির প্রাকৃত ধারা।

তুলনা করা যেতে পারে একটু। ধরুন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ—তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত প্রকৃতিপূজারী—কিন্তু ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের চেতনা স্বভাবতই ছিল অন্তর্মুখী (আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকেরা কেউ কেউ বলবেন introvert)। প্রকৃতিকে তিনি দেখতেন অনুভব করতেন, এই অন্তর্মুখিতার ভিতর দিয়ে—প্রকৃতি তাঁর হাতে তাই পেয়েছে একটা প্রশান্তি, একটা স্বচ্ছতা, একটা সৌকুমার্য, একটা চিন্ময়তা। শেলীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি বাহ্য রূপের সঙ্গে পেয়েছে একটা অন্তরের ভাব ও অর্থ, দুটিতে অভিন্ন হয়ে মিশে আছে, বাহ্য রূপটি ভিতরের ব্যঞ্জনার প্রতীক—বাহ্যটির চেয়ে ভিতরের অঙ্গটির উপর জোর বেশি। কীট্‌স্ আরো স্থূলভাবে, ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখিতাকে আশ্রয় করে প্রকৃতির সাথে সংযোগ স্থাপন করেছেন, তা হলেও প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বাধীনা ও স্বতন্তরী হয়ে উঠতে পারে নাই—সেখানেও একটা মানসভাবনা প্রকৃতির রূপায়ণকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আমাদের বৈদিক ঋষিরাও প্রকৃতির পূজারী ছিলেন—কিন্তু তাঁদের জ্যোতির্ময় প্রজ্বলন্ত দৃষ্টিতে প্রকৃতি রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে—প্রকৃতিকে আর প্রকৃতি হিসাবে দেখি না, দেখি অন্তশ্চেতনার বাহ্যপ্রকাশ ভাস্বরমূর্তি হিসাবে। প্রকৃতির নিবিড় রঙ রেখা— অবয়ব— আমাদের কাছে ব্রহ্মচেতনারই অনুভব নিয়ে আসে।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য যদি কোন কবির সঙ্গে থাকে তা হল কালিদাসের সঙ্গে। কালিদাসের উল্লেখ, স্মৃতি, কালিদাসের

অনুকরণ অনুসরণ রবীন্দ্রনাথে ইতস্তত যথাতথা প্রচুর বিক্ষিপ্ত রয়েছে। প্রকৃতিকে প্রকৃতি হিসাবে ভালবাসা, তাকে স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হিসাবে বোধ করে স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করা—কালিদাসের বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রনাথেরও। শুনুন রবীন্দ্রনাথের হাতে কালিদাস—

কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট, কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি; বেত্রবতীকূলে
পরিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা,
পথ-তরু-শাখে কোথা গ্রাম-বিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে
বনস্পতি—

তবে উভয়ে পার্থক্য আছে। কালিদাস প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছেন ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন ইন্দ্রিয়ের অনুভব দিয়ে। কালিদাসে পাই চিত্রের ও ভাস্কর্যের ধর্ম ও রীতি, রবীন্দ্রনাথে চিত্রের আর সংগীতের ধর্ম ও রীতি। স্পষ্টতর উদাহরণ

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধ-হারা,
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া;
হানি' দীর্ঘধারা—

কিম্বা—

এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত
এ যে অজাগরগরজে সাগর ফুলিছে ;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে ,
কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়শাখা—

ঠাট আরও স্পষ্ট—

গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে গরজে
গগনে।
ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে।—

কবি তাঁর সবুজ বয়সেই সুরদাসের মুখ দিয়ে স্পষ্ট স্বীকার করে গিয়েছেন—

অপার ভুবন, উদার গগন, শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধমূরতি, স্বচ্ছ নদীর জল,

বিবিধবরণ সন্ধ্যানীরদ, গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র প্রসারিত দূরদিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল অতিদূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয় কনককিরণ-জ্বালা,
চকিততড়িৎ সঘন বরষা পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরৎ-আকাশে অসীমবিকাশ জ্যোৎস্না শুভ্রতনু ··
ইহারা আমায় ভুলায় সতত কোথা নিয়ে যায় টেনে—

উদাহরণ-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন।

তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই বাহিরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা এবং ভিতরেরও চেতনা-স্ফুরণের ফলে এসে দেখা দিয়েছে একটা বিশিষ্ট মানসপ্রত্যয়গত ধারা—যুক্তিবাদের ধারা। এইটিকেই আমি বলেছি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চতুর্থ ধারা—তবে এটিকে পৃথক একটি ধারা নাম দেওয়া ঠিক হবে কি না সন্দেহ; কারণ এটি স্বতন্ত্র অঙ্গ ততখানি নয় যতখানি একটি ব্যাপক আবহাওয়া হিসাবে বা পিছনের পট হিসাবে আর সকল ধারার আশ্রয় অবলম্বন হয়েছে, তাদের সকলের ও প্রত্যেকের একটা বিশিষ্ট গুণ এনে ধরেছে। গদ্যে—গল্পে উপন্যাসে নাটকে, বিশেষতঃ প্রবন্ধে—এ জিনিষটি বেশি স্ফুট ও প্রকট। রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় হার্বার্ট স্পেন্সারের ভক্ত ছিলেন, আর ব্রাউনিং তাঁর প্রিয় কবি ছিল বোধ হয় বরাবরই। এ দুটি নাম যে রবীন্দ্রনাথের চেতনায় এসে আটকে পড়েছে তা বড়ই বিচিত্র—বোধ হয় বৈপরীত্যের বা পরিপূরণের নিয়মে এ রকম হয়েছে। উপনিষদ আর স্পেন্সার হল উত্তর আর দক্ষিণ মেরু। আর রবীন্দ্রনাথের

আত্মরতিসার মধুর কোমল কান্ত গীতাবলির সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিষ হল ব্রাউনিংএর পুরুষালি চিন্তাদার্ঢ্য, অনাত্মকেন্দ্রীয়তা (objectivity)। সে যা হোক রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ, স্থূলভাবে যখন প্রকাশ পেয়েছে তখন তিনি প্রতিমাপূজার অসারতা প্রতিপন্ন করছেন, রামায়ণের বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, গুহ্যসাধনতন্ত্রকে পরিহাস করছেন—চিরাচরিত সামাজিক রীতিনীতির উপর কষাঘাত করেছেন। তিনি ভাল করছেন কি মন্দ করছেন, ভুল করছেন কি ঠিক করছেন সে প্রশ্ন আমি আদৌ তুলছি না। আমি বলছি তাঁর প্রকৃতির একটা বৃত্তি বা গুণের পরিচয়। প্রাচীন ঐতিহ্যের, 'মধ্যযুগ'-সম্মত রূপাবলীর অনেক উপকরণ তিনি গ্রহণ করেছেন, শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক বহু উপমা রূপক ও কাহিনী স্বীকার করে নিয়েছেন—কিন্তু তারা সব মস্তিষ্কের ছাঁকনির ভিতর দিয়ে এসেছে, হয়ে উঠেছে বুদ্ধিসমর্থিত, যুক্তিসঙ্গত। ইংরাজীতে এই প্রক্রিয়াটির নাম rationalisation—এ প্রক্রিয়াটির বহু রূপ, বহু ধারা, বহু প্রয়োগ—মনোবিশ্লেষণশাস্ত্র হতে অর্থনীতিশাস্ত্র পর্যন্ত, অনেকেই, প্রায় সকলেই, এ শব্দটি মন্ত্রেরই মত ব্যবহার করেছেন। কারণ সাধারণভাবে ব্যাপকভাবে এ জিনিষ আধুনিক চেতনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জিনিষকে অবোধ্য, কুহেলী-আবৃত, এলোমেলো করে রাখা নয়—তাকে জাগ্রত চেতনায় ধরে সুস্পষ্ট সুষীম করে ধরতে না পারলে তার স্বস্তি নাই। এই যেমন রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক দেবতা মহাদেবের কথা যখন বলছেন তখন তিনি কোনো দেবতার কথা ভাবছেন না, ভাবছেন একটা বিশ্বতত্ত্বের কথা—মহাদেব হলেন মৃত্যু—

তাঁর ববম্ ববম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ—

কবি নিজেই তাঁর মনোভাবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে— প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা ?
দেবতাকে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা—

এ মনোভাবের পাশ্চাত্য নাম humanism— মানবতা কি মানব-সর্বস্বতা। আর এ জিনিষ বুদ্ধিবাদের সগোত্র, সহোদর যদি না-ই হয়। কিম্বা শুনুন মদনভস্মের পৌরাণিকতা কবি কি রকমে বুদ্ধিঠাটময় (rationalise) করে ধরেছেন—

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

তিনি শকুন্তলার ও কুমারসম্ভবের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন— উভত্রই মিলনের পূর্বে একটা বিচ্ছেদের ব্যবস্থা কেন হয়েছে—তাও এই বুদ্ধিতন্ত্রতার পরিচয়। তবে এই 'বুদ্ধিতন্ত্রতা' একটা অপূর্ব সার্থকতা এনে দিয়েছে তাঁর 'উর্বশী' কবিতায়—এখানে বুদ্ধিতন্ত্রতা একটা উদার বিশ্বদৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কারণ বুদ্ধিতন্ত্রতা একদিকে যেমন সংকীর্ণতা ও বাহ্যদৃষ্টি এনে দেয়—তেমনি অন্যদিকে তার ঝোঁক জিনিষকে নির্ব্যক্তিক, সার্বজনীন করে ধরবার দিকে। যে সত্য

নামরূপগত, সংস্কারগত, প্রথাগত—বিশেষ দেশকালপাত্রের মধ্যে আবদ্ধ—বুদ্ধির আলো তাকে উদারতর বৃহত্তর সর্বসাধারণ করে তুলতে চায়। একেই ত বলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি—বিশেষ তথ্য থেকে সাধারণ বিধানের দিকে গতি। সকল কবিতার, যথার্থ কবিত্বের মূল রহস্যই হল সার্বজনীন বিশ্বগত অভিব্যঞ্জনা—আনন্ত্যের প্রকাশ বা আভাস। তবে প্রাচীন কবিরা এ জিনিষটি ধরে দিতে চেয়েছেন ভাবের অনুভবের গভীরতা প্রগাঢ়তা দিয়ে, একাগ্রতা অনন্য-মুখিতা—কালিদাসের ভাষায়—ভাবস্থিরতার সহায়ে। মিলটন যখন বলছেন,

High on a throne of royal state, which far
Outshone the wealth of Ormuz and of Ind
Satan exalted sat, by merit raised
To that bad eminence—

অথবা হোমর যখন বলছেন (ম্যাথু আর্নল্ডের অতিপ্রিয় এক হোমরিক পংক্তি)—

'বন্ধু দুঃখ কর কেন মরতে? পাত্রোকলারও মৃত্যু হয়েছে,
আর সে তোমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল।'

কিম্বা ধরুন আমাদের কালিদাসেরই—

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥[১]—

[১] প্রভু! ক্রোধ সম্বরণ কর, সম্বরণ কর—আকাশের বাণী বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে না পড়তে মহাদেবের তৃতীয় নয়ন হতে সঞ্জাত অগ্নি মদনকে ভস্মীভূত করে ফেলল।

তখন একটি সীমাবদ্ধ বস্তুবিশেষের মধ্যে, একটা সংকীর্ণ উদাহরণের মধ্যে অনুভবকে চেতনাকে সংহত করে ধরা হয়েছে—এবং সেই গাঢ়তার ফলেই আমরা পাই একটা অতলস্পর্শতার এবং সর্বব্যাপকতার আভাস, নিবিড় স্থতরাং উদার সত্যের ব্যঞ্জনা। আধুনিকেরা সার্বিক বা বিশ্বজনীন ভাবকে আয়ত্ত করতে বা প্রকাশ করতে যান অনুভবের প্রগাঢ়তা দিয়ে নয়, বুদ্ধির প্রয়োগকৌশলের প্রসারতা দিয়ে। রবীন্দ্রনাথও আধুনিকের এই পন্থাই অনুসরণ করেছেন। অনুভবকে যতটা সম্ভব খাঁটি ও গাঢ় রেখেছেন (অতি-আধুনিক বা সাম্প্রতিকেরা এ বালাই দূর করে দিয়েছেন), তারই মধ্যে মনের কৌতূহল, বুদ্ধির জিজ্ঞাসা, চিন্তার সিদ্ধান্ত ঢেলে দিয়েছে একটা উদার দূরপ্রসারী আলো-ছায়ার খেলা।

বুদ্ধিজীবী আধুনিক মানুষের চেতনা ক্রমেই তত্ত্বমুখী হয়ে চলেছে। ইন্দ্রিয়গ্রামের অনুভবকেও সহজভাবে না নিয়ে আর-কিছুর অদৃশ্য-রাজ্যের প্রতিচ্ছায়া ও প্রতীক বা আবরণ হিসাবে দেখতে শিখেছে। রবীন্দ্রনাথে এ দুটি ধারাই, ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়াতীতের, বর্তমান এবং যেখানে এ দুটির যৌগিক সম্বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেখানেই তাঁর কবিত্বের পরমোৎকর্ষ, উত্তুঙ্গ শিখর সব। ভবিষ্যতের কবিত্ব এইদিক দিয়েই গভীরভাবে বৃহত্তরভাবে অগ্রসর হবে মনে হয়।

প্রত্যেক মানুষই বিভিন্ন কয়েকটি মানুষের সমষ্টি। বিশেষতঃ যাঁরা লোকোত্তর পুরুষ তাঁদের চেতনা বহুতর পুরুষের চেতনা-সমষ্টি। বিভিন্ন এমনকি বিরোধী ধারা মিলে কি অপরূপ অভিনব ঐকতান সৃষ্টি করতে পারে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা।

অদ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ

ইংরাজীর পক্ষে শেক্সপীয়র যেমন, জর্মনের পক্ষে গ্যেটে যেমন, রুশের পক্ষে টলস্টয় যেমন, অথবা ইতালীয়ের পক্ষে দান্তে যেমন, এবং আরো অতীতে লাতিনের পক্ষে ভর্জিল যা, ও গ্রীকের পক্ষে হোমর যা, কিম্বা আমাদের দেশে উত্তরকালীন সংস্কৃতের পক্ষে কালিদাস যা, বাংলার পক্ষে রবীন্দ্রনাথও তাই, একথা বেশি অত্যুক্তি নয়। এই যে সকল দিকপাল তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের আপন আপন ভাষার ও সাহিত্যের রাজা বা রাজচক্রবর্তী, এবং তা হয়েছেন দুটি কারণে। এক, তাঁদের আগে যা ছিল অপক্ক অপরিণত, তাঁদের পরে তা হয়ে উঠেছে পূর্ণবয়স্ক, যা ছিল প্রাদেশিক গ্রাম্যভাবাপন্ন, তা হয়ে উঠেছে অভিরূপভূয়িষ্ঠ সার্বভৌমিক, যা ছিল সাধনার পর্যায়ে তা হয়ে উঠেছে সিদ্ধ, যা ছিল একান্তের ঘরোয়া জিনিষ তা হয়ে উঠেছে বিশ্বের জিনিষ। বিশেষ-ভাষাকে বিশেষ-সাহিত্যকে এই রকমে বিশ্বভাষা ও বিশ্বসাহিত্যে পরিণত করা হল এই মহাপুরুষদের প্রথম ইন্দ্রজাল। দ্বিতীয় ইন্দ্রজাল হল একটা বিশেষ ভাষা ও সাহিত্যের অন্তঃশক্তিকে তার মর্মগত প্রতিভাকে উদ্ঘাটিত করে ধরা—একটি জাতির স্বভাব ও স্বধর্ম যা, তার শিক্ষাদীক্ষার মূল তন্ত্র যা, তাকে ব্যক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করা ; এ দুটি কাজ—একটি প্রসারতার দিকে, আর-একটি গভীরতার দিকে—অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরনির্ভরশীল এবং প্রায়ই ঘটেছে দেখা যায় ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির ফলে নয়, বরং একটা

আকস্মিক বা দ্রুত স্ফুরণের কল্যাণে।

ভাষার ও সাহিত্যের শৈশব বা অপোগণ্ড রূপ হল ছড়া পাঁচালী, যাকে বলা হয় লোকসাহিত্য—ballad, folklore, মার্জিত ও শক্তিমান ভাষা ও সাহিত্য তা থেকে ফুটে বের হয়, বিকশিত হয় পরে। দান্তের ইন্দ্রজাল এদিক দিয়ে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি যে ভাষার আশ্রয়ে তাঁর কাব্য গড়ে তুললেন তা ছিল লোকভাষা, অন্যান্য বিবিধ জানপদভাষার একটি মাত্র—কিন্তু এইটিকেই তিনি করে তুললেন সমগ্র ইতালীর ভাষা এবং জগতের চক্ষে ইতালীয় ভাষা। গ্রীক ভাষা নিয়ে হোমরও মনে হয় প্রায় অনুরূপ অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি করেছেন। একটা বৃহৎ ও সমুন্নত চেতনার স্থর ও ছন্দ তাঁরা তাঁদের ধূল্যবলুণ্ঠিত উপাদানের মধ্যে ভরে দিয়েছিলেন। গার্হস্থ্য ও গ্রাম্য সীমানায় আবদ্ধ যে কণ্ঠ তাকে অনেকখানিই পরিবর্তিত রূপান্তরিত হতে হয়—বিশ্বকে আহ্বান করে যে কণ্ঠ তাতে পরিণত হতে হলে। আর যেখানে ভাষা ও সাহিত্য এ রকম অপরিপক্ক নয়, ইতিমধ্যেই পেয়েছে একটা পরিণতি ও সৌষ্ঠব, সেখানে এই মহাস্রষ্টারা এসে এনে দিয়েছেন দ্বিতীয় ধরণের রূপান্তর। ভর্জিল, শেক্সপীয়র, গ্যেটে, কালিদাস এই পর্যায়ের কাজ করেছেন। শেক্সপীয়রের পূর্বে ইংরাজী যে অপরিণত গ্রাম্য ছিল তা বলা চলে না—যদিও বিদেশীর কাছে শেক্সপীয়র যতখানি জীবন্ত ও পরিচিত ও অন্তরঙ্গ স্পেন্সর, চসার, এমন কি মার্লোও ততখানি নয়। তবে শেক্সপীয়র ব্যক্ত করে ধরেছেন ইংরাজীর গুণ-বৈশিষ্ট্য, তার অন্তঃস্থ সামর্থ্য—ইংরাজীর বৈচিত্র্যময়তা, নমনীয়তা, তার বীর্যবত্তা তেজস্বিতা আর তার ব্যঞ্জনাশক্তি। ফরাসীর ইতিহাসে অন্যান্য সাহিত্যের ইতিহাস থেকে

একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রথমতঃ ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য বর্ধিত ও পুষ্ট হয়েছে কোন রকম আকস্মিক পরিবর্তন বা আত্যন্তিক বিপর্যয়ের ফলে নয়—সে বৃদ্ধি ও পুষ্টি হল একটা ধীর মন্থর সুশৃঙ্খল ক্রমগতির ফল। ইংরাজীর মধ্যে বরং হঠাৎ অনেকখানি পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে ইংরাজ ও ফরাসী পরস্পরে ঠিক এর বিপরীত পন্থা অনুসরণ করেছে—ইংরাজের স্বাধীনতার যুদ্ধ চলেছে ধাপে ধাপে ক্রমান্বয় ধরে, from precedent to precedent—ফরাসী সর্বদা চেয়েছে তার জন্য বিপ্লব। সে যা হোক, ফরাসীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঠিক এই জন্যই হল এখানে তেমন একজন মাত্র সর্বেসর্বা দিকপাল নাই, অন্যান্য যে উদাহরণ দিয়েছি সেখানে দেখি এক-একটি জাতির এক-একটি—এবং একটিমাত্র—বিভূতি তার সাহিত্যকে ভাষাকে আপন প্রতিভার ইন্দ্রজালে গড়ে তুলেছেন, কি পূর্ণ পরিণত আত্মসিদ্ধ করে দিয়েছেন। ফরাসীরা বেশি সামাজিক, গণতান্ত্রিক তাই অনেকের সহযোগে, একাধিক বিভূতির অবদানে তাদের ভাষা সাহিত্য গঠিত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। কর্ণেই, রাসীন, মোলিয়ের, লা ফন্তেন (বা বাবলে পর্যন্ত)—কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখি? তবু এখানেও, একজনকেই প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা যায়, তিনি হলেন রাসীন। রাসীনই ফরাসীর যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য, মর্মের ধর্ম তার বিগ্রহ। কি সে জিনিষ? এক কথায় তা হল 'শ্রী' —সৌষ্ঠব ও লাবণ্য, কান্তি ও সুষমা, হৃদয়বত্তা ও প্রাণময়তা—elegance ও sensitiveness-এর পরাকাষ্ঠা। এদিকটি ছাড়া ফরাসীর যে অন্যদিক নাই তা নয়। কর্ণেই দিয়েছেন সেই অন্য দিক —দার্ঢ্য ও বীর্য, উদাত্ত গাম্ভীর্য, তপোময় কাঠিন্য। কিন্তু বলা যেতে

পারে এ হল ফরাসী ভাষার ও সাহিত্যের একটা বিশেষ ধারার গুণ, একটা যেন অর্জিত সামর্থ্য, কি হতে পারে তার পরিচয়—কিন্তু অন্যটি, রাসীন যা, তা ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য স্বয়ং, তার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, তার অন্তরাত্মার স্বতঃস্ফূর্ত রূপায়ণ।

ফরাসী সম্পর্কে এই কথাগুলি মনে হল, এ জন্য যে তার প্রধান কথাটি বাংলার পক্ষে বেশ প্রযোজ্য। অবশ্য ফরাসীর মত বাংলায় যে ধীর মন্থর গতিতে ক্রমবিকাশ হয়েছে তা ঠিক বলা চলে না। অন্ততঃপক্ষে একটি বিপর্যয়, বিপ্লবই ঘটেছে—ইউরোপের সংস্পর্শে এসে তার প্রভাবে পড়ে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য যে বাঁক নিয়েছে তা প্রায় about-turn, বিপরীতমুখতা কিন্তু এ বিপ্লব একজনের দ্বারা ঘটে নাই। দান্তে বা হোমর ইতালীর বা গ্রীকের স্রষ্টা, কর্তা বা অদ্বিতীয় অধিষ্ঠাতা—সূক্ষ্ম বিচারে ঠিক সেই স্থান বাংলায় রবীন্দ্রনাথকে দিতে যদি আপত্তি হয়, তবে শেক্সপীয়র যে হিসাবে ইংরাজীকে ইংরাজীয় গণ্ডী, তার দ্বৈপায়ন পরিধি, কিম্বা যে হিসাবে টলস্টয় রুশকে রুশীয় গণ্ডী পার করে বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছেন সেই হিসাবে, অথবা ভর্জিল বা গ্যেটে যে রকমে লাতিনকে ও জর্মনকে একটা নবস্ফুরণ—কাব্যাত্মার পূর্ণ জাগরণ—এনে দিয়েছেন সেই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় একচ্ছত্র বিভূতি। তবে আমার মনে হয় যথাযোগ্য হিসাবে আমাদের মধ্যে তিনি পাবেন রাসীনের আসন। বাংলার যা বিশেষ গুণ, তার অন্তরাত্মার যে সুর ও ছন্দ—অন্তরাত্মার, ভাবময় পুরুষেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, হৃদ্গত তন্ময়তা—যার প্রথম মুখ খুলেছে চণ্ডীদাসে—এবং বঙ্কিমও যে ধারাকে প্রসারিত করেছেন—রবীন্দ্রনাথে তাই পরিণত বিচিত্র তীব্র পূর্ণ প্রকট হয়েছে।

এখানেও 'শ্রী'রই এক প্রকাশ। ফরাসীর মত বাংলাতেও ভিন্ন এক ধারা আছে—এদিকের সম্ভাবনা সূত্রপাত করেছেন মধুসূদন, এবং আধুনিকেরা দুইচারজন এই ধারাকে সঞ্জীবিত ও সচল করবার চেষ্টায় আছেন। তবে মধুসূদন বাংলার ঐশ্বর্যের দিক—'মাথুর' পর্যায়; বাংলার স্বাভাবিক শ্রীর দিক—বৃন্দাবনীয় পর্যায়—পরমোৎকর্ষ লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথে। তাই রবীন্দ্রনাথও আমাদের মধ্যে 'একং অদ্বিতীয়ং।

রবীন্দ্রনাথ ও মৃত্যু-অভিসার

যাঁর কিশোর-কণ্ঠে মৃত্যুকে আবাহন করতে শুনেছি কল্পনা-কাকলীর ললিতছন্দে—

মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যামসমান।
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান ···

পরিণত বয়সে শেষ প্রান্ত অবধি—প্রায় মৃত্যুর সম্মুখেও—ঐ একই কথা তাঁকে বলতে শুনেছি, তবে ঋষিসুলভ গাম্ভীর্য ও অর্থগৌরবে ভরপূর মন্ত্রের ভিতর দিয়ে যেন·

হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

মৃত্যুকে মানুষ যে কত বিভিন্ন ভাবে ও রূপে দেখেছে তার ইয়ত্তা নাই। মৃত্যু একটা প্রহেলিকা—অজ্ঞেয় অচিন্ত্য বস্তু, তাই কখনো জাগায় ভীতি বিভীষিকা। হ্যামলেট যেমন বলেছে—

But that the dread of something after death—
The undiscover'd country, from whose bourne
No traveller returns

—*Hamlet*

তাই তখন সে হয়ে ওঠে দণ্ডপাণি যমরাজা—ধ্বংসকারী নটরাজ—কালী করালী নৃমুণ্ডমালিনী। মৃত্যুর ক্রূর কঠিন হস্ত কেবল চায় জীবকে কষ্ট দিতে, নিপীড়ন করতে। মৃত্যু তাই দানবী শক্তি—মানুষের কল্যাণ চায় না, শ্রী দেখতে পারে না। মৃত্যুর অট্টহাস্য আসে পাতাল থেকে, স্বর্গ থেকে নয়। গ্রীকদের মৃত্যুর রাজ্য তাই অন্ধকার—দারুণ বিস্মৃতির গহ্বর একটা—ঘোর অচৈতন্যের আবাস অথচ শোকচ্ছায়াচ্ছন্ন। মানুষের সব লুপ্ত হয়ে গিয়েছে সেখানে—বয়ে গিয়েছে যেন শুধু দুঃশ্বাস। (গ্রীকদের Lethe কি আদি খৃষ্টানদের Limbo স্মরণীয়।)

তাই ত মৃত্যুকে বলা হয় অন্তক—অন্তকারী। তাই শমন হল এমন দুর্দমন যে তাকে দমন করা জয় করা মানুষের একটা চিরকালের আকাঙ্ক্ষণীয় সাধ্য বস্তু হয়ে আছে। এ কাজ যারা পেরেছে, তাদেরই নাম অমর, দেবতা—মহাদেবের নাম তাই মৃত্যুঞ্জয়। তাই ত মানুষ বলতে চায় এমন দিন আসবে যখন মৃত্যুর রাজত্ব থাকবে না—

And death shall have no dominion.

—Dylan Thomas

এমনকি মৃত্যুরও যখন হবে মৃত্যু, মানুষের পরম পুরুষার্থ হবে তাই

Even there shall come as a high crown of all
The end of Death...

—*Savitri*

মৃত্যুর কোমলতর রূপও আবার মানুষ প্রচুর দেখেছে, কল্পনা করেছে। তখন বলা হয়েছে মৃত্যু যে দণ্ডধারী, সে দণ্ড পাপীর জন্য,

পুণ্যবানের জন্য নয়। ফলতঃ যমরাজা হলেন ধর্মরাজা—কারণ তিনিই পুণ্যবানকে স্বর্গে নিয়ে যান, পাপীকে চালান দেন নরকে। কর্মফলের বিধাতাই মৃত্যু।

আবার এমন দৃষ্টিও আছে যাতে মৃত্যুকে কোনো প্রাধান্যই দেওয়া হয় না ; মৃত্যু হল দেহ-পরিবর্তন মাত্র অর্থাৎ বসন-পরিবর্তনের চেয়ে তার বেশি মূল্য নাই। মৃত্যু ভয়ের জিনিষ নয়, আদরের জিনিষও নয়। তার সম্বন্ধে পূর্ণ ঔদাসীন্যই হল যথাযথ মনোভাব।

রবীন্দ্রনাথ, আমি বলেছি, মৃত্যুকে বাম মূর্তি দিয়ে দেখেন নাই, তিনি দেখেছেন দক্ষিণা মূর্তি দিয়েই। উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন একদিন—

হে রুদ্র! তোমার যে দক্ষিণ রূপ তাই দিয়ে আমাদের রক্ষা কর!

রবীন্দ্রনাথও প্রায় ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—

হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে, নূতন অরুণ লিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত—

মৃত্যুর যে কান্তরূপ আমাদের কবির কাছে উপস্থিত হয়েছে তাতে আছে আবার বিবিধ আকার ও ভঙ্গী—তার মধ্যে একটা ক্রমপরম্পরা আমরা নির্দেশ করতে পারি। প্রথম আদি মূর্তি হল যা পরমা শান্তি, একান্ত উপরতি।

আজিকে হয়েছে শান্তি, জীবনের ভুলভ্রান্তি
সব গেছে চুকে,

রাত্রিদিন ধুক্ ধুক্ তরঙ্গিত দুঃখসুখ
থামিয়াছে বুকে।
যত-কিছু ভালোমন্দ যত-কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব
কিছু আর নাই,
বলো শান্তি, বলো শান্তি দেহ সাথে সব ক্লান্তি
হয়ে যাক্ ছাই।

কিম্বা

যবে সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল
পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নমিয়া
তুমি পাশে আসি বস অচপল,
ওগো অতি মৃদুগতি-চরণ…
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
করি হৃদিতলে অবতরণ?
তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষ-শোণিতে?…

পাশ্চাত্যের কবি এ মূর্তিকে লক্ষ্য করে বলেছেন

After life's fitful fever he sleeps well…

—*Macbeth*

কিম্বা

As sweet as balm, as soft as air, as gentle…

—*Antony and Cleopatra*

কিন্তু এ হল প্রথম স্পর্শ—আরো গাঢ়তর অনুভব আছে আগে।

কারণ এ শুধু লয় বা বিরতি মাত্র নয়। শুধু শূন্যম্ নয়—কেবলই সব-শেষ—যার মধ্যে যাব, পরে আর কিছু নাই, যে অনুভব নিয়ে Othello বলছেন :

Here is my journy's end, here is my butt ..

"এ হল পূর্ণতার প্রশান্তি, পরিণতির পরিসমাপ্তির যে স্থৈর্য, সব ভরাট হয়ে গেলে আসে যে নিশ্চপলতা নিশ্চলতা।"

জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি—

মৃত্যু শুধু শেষ নয়,—শূন্য বা রিক্ততা নয়, ব্যক্তিগত একটা পূর্ণতাও নয় শুধু—তা হল আবার ব্যক্তিকে অতিক্রম করে বিশ্বের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবার পথ, দয়ার উপায়। দেহ চূর্ণ হয়ে যায়, ধূলিসাৎ হয়ে যায়, প্রাণ মনও ক্রমে ভেঙে গলে যায়, মিশে যায় বিশ্ব-চরাচরে। মৃত্যুর অর্থ তাই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি—ব্যক্তিগত পঞ্চভূত বিশ্বগত পঞ্চভূতে একীভূত হয়ে যাওয়া। এই পরিণতিকে লক্ষ্য করেই কবি একদিন বলেছিলেন .

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে—

মৃত্যু এনে দেয় বিশ্বদেহের সঙ্গে একত্ব ও একাত্মতা—ইংরাজ কবি এই সত্য বা অনুভূতির কথাই বলেছেন তাঁর লুসি সম্বন্ধে—

Rolled round in earth's diurnal course,
With rocks, and stones, and trees.

—Wordsworth

এই রহস্যটি কবি অন্য দিক দিয়ে ব্যক্ত করেছেন তাঁর 'সোনার তরী'র কবিতায় এবং তৎসংক্রান্ত ব্যাখ্যায়। কথাটি প্রণিধানযোগ্য ও চিত্তাকর্ষক তাই আমরা উল্লেখ করি। মানুষ-জীবনের সত্যকার সার্থকতা হল—কি দিয়ে যায় কি রেখে যায় সে তাই দিয়ে; তার কর্মের সারাংশ—কবি বলেছেন 'নিত্যফল'—হল তার দান, এইটিই হল বিশ্বের সংসারের খাতায় তার জমা—আর সব খরচ, বিশেষতঃ তার অহংবোধ হল মৃত্যুর কাছে যেন খাজনা, তার, মৃত্যুর হাতেই একে তুলে দিতে হয়—এ সব জিনিষ আর চিরন্তন হয়ে থাকে না, বিশ্বজীবনের অঙ্গীভূত হয়ে তার উপচয়ে সাহায্য করে চিরঞ্জীব হয় না।

এখন তা হলে বুঝব জীবন ও মৃত্যু দুটি বিরোধী বিপরীত জিনিষ নয়। উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। বৈদিক ঋষি বলেছেন কৃষ্ণা ও শুভ্রা দুই মাতার কথা—রবীন্দ্রনাথ উভয়ের সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্ঠ করে ধরেছেন। বলেছেন জীবন ও মৃত্যু একই মাতৃবক্ষে স্তনযুগল; শিশুর পক্ষে তা স্বাদ-পরিবর্তন মাত্র—

মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো…
স্তন হ'তে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

বাহিরের চোখে দেখি মৃত্যু যেন অন্ধকারের যবনিকা টেনে দিল, বিচ্ছেদ ঘটাল দেহে দেহে—এক ফরাসী কবি যেমন বলছেন, না, মৃত ওরা, চোখদুটি ওদের বন্ধ করে রয়েছে এদিকে, তার কারণ তাদের খুলে তারা ধরেছে আর-এক দিকে, এদিকের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে, সে দৃষ্টি ফেলেছে আর-এক দিকে,[১] সেইরকম আমাদের কবিও বলেছেন—

জীবন আঁধার হ'ল সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে—

—শেষের কবিতা

আরো স্পষ্ট সহজ ভাষায়—

বুঝি এমনি করেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্ন পর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।

---

১ Ils se sont tournés quelque part
Vers ce qu'on nomme l'invisible ;

Ouverts à quelque immense aurore,
De l'autre côté des tombeaux
Les yeux qu'on ferme voient encore.

—Sully Prud'homme

মৃত্যু তাই সন্ধ্যা নয়—অথবা বলতে পার তা হল ভোরের সন্ধিক্ষণ, কারণ চোখ খুলে ধরে সে নূতন আলোকে।

মৃত্যু যে একটা আহ্বান আবার, ভূমার দিকে বীর্যের দিকে, মুক্তির চির নবীনের দিকে তাও স্মরণে রাখতে হবে। কবি তাই বলছেন—

যদি কাজে থাকি আমি গৃহ-মাঝ
তুমি ভেঙে দিও মোর সব কাজ…
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধো জাগরূক নয়নে
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ—

মুক্তিদাতা মৃত্যুকে স্বাগত করছেন কবি—

বদ্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে—

পৃথিবীর সব টান সব ভার ফেলে দিয়ে আজ প্রয়াণ পর্যটন অবাধ ব্যোমে—অন্যতর লোকে নবতর অভিজ্ঞতার দিকে—কবি কি সুন্দর ভাবগাঢ় সান্দ্রকণ্ঠে বলছেন—

পশ্চাতের সহচর ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা—
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও। আজি মেঘমুক্ত শরতের
দূরে-চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চির পথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।

পাশ্চাত্যের এক কবিও ঐ সুরে সুর মিলিয়ে বলছেন—

নোঙর তোল, নোঙর তোল, মাঝি ! সময় বয়ে গেল—তোল পাল !
দেখছ না, বুক আমাদের আলোয় আলোয় ভরে গিয়েছে ![১]

কিন্তু দূরের ও-পারের টান যতই থাক না, অসীম মুক্তির অবাধ বিচরণ যতই কাম্য হোক না, 'জ্যোতিরুত্তমং' যতই প্রাণকে প্রলুব্ধ করে থাকুক না, যিনি বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি কখনো স্বীকার করেন নি, পৃথিবীকে যিনি সর্বাঙ্গ দিয়ে এত ভালবেসেছিলেন, ধরার ধূলার সঙ্গে মাটির সঙ্গে এতখানি অন্তরঙ্গতা ও ঐক্য অনুভব করেছিলেন, স্থূল পঞ্চভূতের মধ্যে নিজের পাঞ্চভৌতিক সত্তা এতখানি মিশিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর পরম নিষ্ক্রমণের সময় যে এপারের দিকে একটা কারুণ্যময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, বিদায়ের সময়েও নিবিড় আদরে একখানি হাত বাড়িয়ে দেবেন না, তা আমরা আশা করি না। যাবার সময় পিছনের অতীতের স্মৃতি ভেসে ওঠে সব—

চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে ,
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।

যত ক্ষুদ্র তুচ্ছ নগণ্য হয় তারা তত যেন তারা আপনার হয়ে কাছে দেখা দেয় :

---

১ O Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l'ancre !...
Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons !
—Charles Baudelaire

সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী
যার মূর্ছনায় মেশা এ-জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।

চলে গেলেও, এখানকার কিছু একটা সঙ্গে নিয়ে যেতেই হয়—Naked we come, naked we go, কথাটা ষোল আনা সত্য নয়; এখানকার মাটি এখানকার ধূলির মধ্যে নিহিত রয়েছে যে সত্য যে জ্যোতি যে আনন্দ তা আমাদের চেতনাকে সত্তাকে অভিসিঞ্চিত করেছে, উপচিত করেছে, সুশোভিত করেছে—তা চিরকালের সম্পদ—

শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, "তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।

এই মর্মবাণী শুনে আমাদের মনে পড়ে আর একখানি ছবি—সেই গগন-বিহারী বিহঙ্গের কথা, সুদূরের যাত্রী হয়েও যে নিবিড়ভাবে বাঁধা রয়েছে পৃথিবীর বাস্তুঘরের খুঁটির সঙ্গে—

Ethereal minstrel, pilgrim of the sky...
True to the kindred points of heaven and home.

আমাদের বৈদিক ঋষিরাও কি বলেন নি

দ্যৌর্মে পিতা···মাতা পৃথিবীরিয়ম্—

শেষের রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমচন্দ্র একবার কালিদাসের দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন দু'রকমের অর্থাৎ দু'বয়সের কান্নার বা শোকেব পার্থক্য— বার্ধক্যের আর যৌবনের। মহাজনপদাঙ্ক অনুসরণ করে আজ আমি একটু দেখাতে চেষ্টা করব ববীন্দ্রনাথের দু'বয়সের দু'বকমের মনোভাব, অভীপ্সা বা আদর্শ। তাঁর প্রথম দিকেব, যৌবনের আশা আকাজ্ক্ষা আমরা জানি সকলে, কত ভাবে কত ভঙ্গিতে কত বার তিনি ঘোষণা করেছেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে

কিম্বা

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়

অথবা

মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে!
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি—
কর্মযোগে তাঁব সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে—

আরো পূর্ণতর উদাত্ত কণ্ঠে বিপুল নির্ঘোষে নিঃসন্দেহ চিত্তে বলেছেন তিনি—

যুগযুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী,
হে অপূর্বশোভনা উর্বশী।
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারি ভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গ-সম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধচিতে
উদ্দাম সংগীতে।
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।

এ হল যৌবনের অভীপ্সা।

এই সৃষ্টি এই মাটি এই দেহ একটা ভুল ভ্রান্তি, একটা মহাপাতক বা বিভীষিকা নয়,—তা ভগবানেরই প্রকাশ, স্বর্গেরই প্রতিমূর্তি—শ্রীময়ের আনন্দময়ের লীলাকমল। দুঃখ আছে বটে, আঁধার আছে, মেঘ আছে—কিন্তু তা হল আনন্দকে আলোকে আরো স্পষ্ট করে ফুটিয়ে ফলিয়ে ধরবার জন্যে। সরু-মোটা দুটি তার মিলিয়ে হয়েছে এই প্রকাশের ঐকতান। মোটা তারের দৌলতেই সরু তার পায় ধ্বনির ও ছন্দের ঔদার্য গাম্ভীর্য মহাপ্রাণতা। বৈচিত্র্যের ঐ ঐশ্বর্য কোথায় থাকত, অনুভবের গাঢ়ত্ব ও তীব্রত্বই বা কোথায় থাকত যদি অশ্রু ব'লে বিরহ ব'লে আমরা কিছু না জানতাম—সপ্তবর্ণের পরিবর্তে দেখতাম শুধু একঘেয়ে সাদা রঙ।

ভাল কথা। কিন্তু পরে, জীবনের পাতা উল্টে গিয়েছে যখন অনেক, তখন—সর্বশেষে শুনছি এই বাণী—রবীন্দ্রনাথের এটি সর্বশেষ লিখিত কবিতা, সবটাই উদ্ধৃত করলাম এখানে—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে

শান্তির অক্ষয় অধিকার।

স্বর গাঢ়তর, দৃষ্টি সংহত, ভঙ্গি স্বচ্ছ পরিচ্ছিন্ন—কিন্তু ভিন্ন একটা কথা বলছে না? অন্য রকমের সিদ্ধান্ত নয় কি? সুরের মধ্যে পাই না শুনতে—আর্নল্ডকে বিক্ষুব্ধ করেছিল যে—

eternal note of sadness

শেক্সপীয়রকে পর্যন্ত বলিয়েছিল—

And in this harsh world draw thy breath in pain—

জীবনকে পৃথিবীকে যে সব আখ্যা দেওয়া হয়েছে এখানে—ছলনা, বিড়ম্বনা, প্রবঞ্চনা, কুটিল, মিথ্যা—এ বিশেষণ-সমারোহ কি ভাব জাগায় আমাদের মনে প্রাণে? প্রকৃতিকে ছলনাময়ী কৌতুকময়ী রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—আমাদের বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে কুটিল কালা, শঠের রাজা নাম দিয়েছেন অক্লেশে। কিন্তু তার অর্থ ভিন্ন, সুর ভিন্ন।

কোথায় আলো কোথায় আলো
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো—

এ ত আনন্দের উৎসাহের কথা—জীবনকে পূর্ণ স্বীকৃতির কথা। প্রকৃতির ছলাকলা, পার্থিব জীবনের লুকোচুরি খেলা, এ সবের ভিতর দিয়ে, এ সবকে আশ্রয় করে, এদের সহায়ে সাহায্যে, এ সবের দৌলতেই ত মিলনের পরিপূর্ণতার সার্থকতার পরাকাষ্ঠা। কিন্তু যখন বলা হয়েছে—

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত

এখানে সৃষ্টিকে আর কোন রকমে উপায় হিসাবে সহায় হিসাবে সহযোগী হিসাবে আর দেখা হয় না—সে প্রায় বিপক্ষের শত্রুপক্ষের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে। অন্তরাত্মা, মানুষের চিন্ময় সত্তা তাকে চিনে জেনে সহ্য করে যেতে পারে শুধু—স্থির দৃষ্টিতে প্রশান্ত চিত্তে আপন আর্জবের সারল্যের জোরে ভেদ করে পার হয়ে যাওয়াই তার মহত্ত্ব মাহাত্ম্য—এই আক্রমণের সময়ে তার শরীরে যে লাঞ্ছনার দাগ পড়ে যায় তাই তার রাজটিকা। এখানেও শুনি যেন সেই একই নিষ্ক্রমণের অভীপ্সা শ্রীকৃষ্ণের মহাবাক্যে যা একদিন স্বাগত করা হয়েছিল .

অনিত্যমসুখমিমং লোকং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্

কথাটা আরো একটু স্ফুট করে বলি তবে। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন চেয়েছেন একটা সমন্বয় সামঞ্জস্য সম্মেলন। দুটি বিভিন্ন বিরোধী জিনিষকে, দুটি বিপরীত প্রান্তকে তিনি দেখেছেন একটা সাম্যের সহযোগের দৃষ্টিতে—স্বর্গ ও মর্ত্য, দেবতা ও মানুষ, ঐহিক ও পারত্রিক, চিন্ময় ও মৃন্ময়, আত্মা ও দেহ, ব্রহ্ম ও জগৎ, যাজ্ঞবল্ক্যের মত তিনিও বলেছেন তাঁর চাই দুটিই—উভয়মেব। তবে যৌবনে, জীবনের প্রথম দিকে জীবনের, পৃথিবীর, 'ইহৈব'-এর যত স্তুতি, প্রশংসা করেছেন ততখানি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন নি বিপরীত দিকটি সম্বন্ধে—অকুণ্ঠভাবেই তখন বলতে পেরেছেন

থাকো স্বর্গ, হাস্যমুখে—করো সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান,
মোরা পরবাসী। মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা…

অবশ্য ভরা-যৌবনেও তিনি উৎকণ্ঠে বলেছেন

আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী—

কিন্তু এ সুদূর সুন্দর কারণ তা নিকটকে ঘিরে রয়েছে, আত্মা সুন্দর কারণ তা দেহেরই মধ্যে অনুস্যূত। অন্য দিকে এই জগৎ-অতিরিক্ত বস্তুই জগৎকে সুন্দর করেছে। জগতের অসুন্দর জিনিষও সুন্দর কেন? পৃথিবীর ধূলিকালি দুঃখদৈন্য ক্লেদমালিন্য তাদের তিক্ততা বর্জন করে একটা সুস্বাদই গ্রহণ করে যখন তাদের অন্তরে দেখি, তাদের ঘিরে রয়েছে দেখি আত্মার আনন্ত্য ও জ্যোতি। সসীমকে যখন দেখি অসীমের দৃষ্টি দিয়ে—Sub specie aeternitatis—তখন সসীম লাভবান হয়, রূপান্তরিত হয় ত বটেই, কিন্তু এর চেয়েও বড় আশ্চর্য হল অসীমের নিজের লাভ—এই তত্ত্ব ও তথ্য রবীন্দ্রনাথে একটা বিশেষত্ব। আমি আছি বলে, ভক্ত আছে বলে, তুমি তুমি হয়েছ, ভগবান হয়েছ, পূর্ণসার্থকতা পেয়েছ—

তোমার আলোয় নাই ত ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়া—

যৌবনের যৌগপদ্যের মধ্যেও এই যে এক-দিকের—এই-দিকের উপর ঝোঁক তা ক্রমে বয়ঃপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে চলেছে যেন—ক্রমে এসেছে পাল্লার অন্য দিকের, ঐ-দিকের উপর ঝোঁক। ও-পারকে অসীম-অনন্তকে আত্মাকে ক্রমে তার নিজস্ব-মর্যাদা, তার স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে—সীমার মর্যাদার উপর নির্ভর না করে। এ সব কিছুই যদি না থাকে তবুও সে-বস্তু প্রতিষ্ঠিত থাকবে স্বে

মহিম্নি—কবি বলেছেন তাই, কাব্যের পোশাকি ভাষা ছেড়ে দিয়ে, সহজ সোজা কথায়—

তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা-সূত্রে-গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে ;
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়
—পঁচিশে বৈশাখ : শেষ সপ্তক

যৌবনের সেই উদাত্ত পার্থিক কণ্ঠ

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী

কিম্বা

নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল-গানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি—

তা থেকে কত দূরে চলে এসেছি, তা কত পিছনে ফেলে এসেছি অর্থের দিক দিয়ে, ভাবের দিক দিয়ে, ভঙ্গির দিক দিয়ে। এই যে-সব জিনিষ তিনি আলিঙ্গনে ধরে রেখেছিলেন, আজ তাঁদের বন্ধন শিথিল হয়েছে, একটা সস্নেহ দৃষ্টি তাদের উপর রেখেছেন তবুও—

দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে,
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি—

এই অভিবাদন একটা সমস্ত জীবনের পৌর্বাপর্য রক্ষা করেছে নিশ্চয়—কিন্তু তবু পিছনে রয়েছে একটা গাঢ়তর কারুণ্যময় স্বর। মাটির সঙ্গে অন্তরাত্মার সম্বন্ধ ও সংযোগ রয়েছে এখানেও—কিন্তু যৌবনের সে নাড়ীর বন্ধন কেটে গিয়েছে যেন, এ হল কতকটা ছায়াতপের সম্বন্ধ।

কবি সৃষ্টিকে যতই আদর করুন না এখন তা দাক্ষিণ্যের নয়, তা যেন বামমার্গীয়—অর্থাৎ যেমন বলেছি, ততখানি সহায় হিসাবে নয় যতখানি বাধা হিসাবে। সৃষ্টি এখন ততখানি প্রকাশ নয়, যতখানি আবরণ বা মুখোশ। উপনিষদ একদিন বলেছিল: এই যা-কিছু দেখা যায় চঞ্চল জগৎ হিসাবে তা সত্যকে ঢেকে রেখেছে—হে জ্ঞানসূর্য, তুমি তাকে সরিয়ে দাও, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। মুখোশ বলছি, সত্যই তা মুখোশ—কারণ তা শুধু ঢেকে রাখে না, তা বিকৃত করে। সে মুখোশ আবার এঁটে থাকে, সহজে খোলা যায় না। কবি নিজেই শেষটায় বলেছেন—

কষ্টের বিকৃত ভাণ, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত—
অন্ধকারের ছলনার ভূমিকা তাহার।
যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।

… জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা
দুঃখের পরিহাসে ভরা……

প্রাচীনতর যুগে প্রায় সকল দেশেই (আমাদের দেশে এখনো যেমন ‘কথাকলি’ নাট্যে) অভিনয় করা হত মুখোশ পরে—আর সে মুখোশ স্বাভাবিক ও সুন্দরের চেয়ে অস্বাভাবিক ও অসুন্দরই করে গড়া হত। সৃষ্টির মায়াময় দেহ কি এই রকমই নয়? লৌকিক একটা ধারণায়, কি কিম্বদন্তীতে এবং আধ্যাত্মিক অনুভবের ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে যে অপশক্তিরা অপরূপসুন্দর মূর্তি ধারণ করে মানুষের কাছে আসে, তাদের পথ ভুলিয়ে নিতে চায়—কিন্তু স্বরূপে তারা কদর্য কুৎসিত বিভীষিকা, অন্তরাত্মার সত্যসন্ধ প্রখর আলো তাদের সে রূপ অব্যর্থভাবে ব্যক্ত করে ধরে।

এই রকম একটা মুখোশের জগৎই কি রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রাবলীর মধ্যে ফুটে ওঠে নি? রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনা ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কণ দুটি বিভিন্ন এমন-কি বিরোধী দৃষ্টির ও পদ্ধতির পরিচয় দেয় না? তাঁর কাব্য হল যেখানে যত সুন্দর রূপ আছে তা বেছে নিয়ে একত্র করে গড়েছেন যে তিলোত্তমা—তাঁর চিত্র হল এই বাহ্যরূপের অন্তরালে রয়েছে যত—তিনি নিজেই যাদের নাম করেছেন—বিকৃত ভাণ, বিকট ভঙ্গি, মিথ্যা কুহক, বিভীষিকা—তাদের স্বরূপ প্রকাশ।

কবিশিল্পীর শেষ অনুভব এই কথাটিই বড় করে গাঢ় করে দেখেছে। আনন্দ হতেই এই যা কিছু আছে তারা জন্ম নিয়েছে,

আনন্দের মধ্যেই রয়েছে, আনন্দের দিকেই চলেছে—এই ঔপনিষদ অনুভূতি সৃষ্টির সব ব্যাখ্যা দেয় না আর। এখন সমস্যা এবং মীমাংসাকে এইভাবে বরং উপস্থিত করা যায়—দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা—দুঃখত্রয়ের অভিঘাতই মানুষকে সচেতন ও জিজ্ঞাসু করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথ যে নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়েছেন তা নয়—কিন্তু ঐহিকের যে নিজস্ব সত্য ও সার্থকতা একদিন যৌবন তাঁকে দেখিয়েছিল, অন্তে তার রঙ কিছু বদলে গিয়েছেই—ববং প্রাচীন চিরন্তনী ঔপনিষদ দৃষ্টির কাছে গিয়েছেন; বলছেন যেন—

তত্ত্বমপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।

বলছেন তাই

নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব, নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই;
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে
যেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরক-সম প্রচ্ছন্ন রযেছে আপনাতে।

—সানাই

একটা পার্থক্য যা তাঁর বিশেষত্ব হয়ে রইল তা এই যে, প্রাচীন পথে মানুষ যখন তার শেষ সীমায়, পরমে ব্যোম্নি পৌঁছে, তখন সে পৌঁছে রিক্ত হয়ে, সব মুছে—কালিমা এবং মহিমা উভয়ই—নিরঞ্জন কেবলম্ হয়ে গিয়ে; রবীন্দ্রনাথ পৌঁছলেন কিন্তু ঋদ্ধ হয়ে পূর্ণ

হয়ে, সকল অনুভবের অভিজ্ঞতার সারাংশ গ্রহণ করে আপনার স্বরূপ চেতনাতে পরাকাষ্ঠায় উপচিত করে—

সারা দিবসের দৈন্যের শেষে সঞ্চয় সে যে
সারা জীবনের স্বপের আয়োজন।

—উদ্‌বৃত্ত

বাংলা ও ইংরেজী রবীন্দ্রনাথ

বাংলা রবীন্দ্রনাথ বলছেন— কথাগুলি আমাদের সকলের অতি পরিচিত ও অতি আদরের—

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা
এই কি ভালে ছিল রে লিখা,
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।

ইংরেজী রবীন্দ্রনাথে এর প্রতিরূপ হল—

Light, Oh where is the light? Kindle it with the burning fire of desire!

There is the lamp but never a flicker of a flame,—is such thy fate, my heart! Ah, death were better by far for thee!

কি পার্থক্য দুটিতে? রূপান্তর ত বটেই, ঘটেছে একটা ভাবান্তর এবং ধর্মান্তর— বলব কি একটা sea-change?

আচ্ছা শোনা যাক আরো খানিকটা। বাংলায়—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।

আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার!
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।

এর ইংরেজী—

Art thou abroad in this stormy night on the journey of love, my friend? The sky groans like one in despair

I have no sleep to-night Ever and again I open my door and look out on the darkness, my friend!

অভাবের দিকটা বেশ স্পষ্ট— বিশেষতঃ বাঙালীর কাছে, বাঙালীর মনে প্রাণে কানে— সেখানে যে নিবিড় অধীর আকৃতি, যে চিত্তহারী রসবৈদগ্ধ্য, যে মধুর বাকচাতুর্য অনুরণিত, যার স্পর্শে প্রায় আত্মহারা হয়ে যাই— ভাষান্তরে সে কুহক অনেকখানি মুছে গিয়েছে, উজ্জ্বলশ্রী সাদামাঠা হয়ে গিয়েছে যেন— যেন কবিত্বের বাহন পদ্য ছেড়ে যখন গদ্য আশ্রয় করেছি তখন গদ্যেরই ধর্ম স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু এহ বাহ্য।

প্রথমেই স্মরণে রাখতে হবে জিনিষটি অনুবাদ বা তর্জমা নয়— একই বস্তু ভিন্ন পাত্রে ঢালা হয়েছে বটে, কিন্তু ঢালার ফলে গুণ হারায় নি ততখানি যতখানি তা বদলে গিয়েছে, পাত্রান্তরের ফলে যেন গোত্রান্তর ঘটেছে। বিষয় এক, বক্তব্য এক, বস্তু এক, মূল অনুভূতিও একই, অর্থ এক, যে ছবির আশ্রয়ে তা ফলিয়ে ধরা

হয়েছে তাও এক— কিন্তু প্রাণ এক নয়, প্রাণের ছন্দ ও রসায়ন এক নয়— নূতন দেহ তার মধ্যে সঞ্জীবিত করে ধরেছে নূতন জীবনীধারা। কাব্যজগতে এ ধরণের ধর্মান্তর ও রসান্তর একটা পরিচিত ঘটনা; এর সর্বজনবিদিত উদাহরণ হল ইংরেজীতে ফিট্‌জেরাল্ডের ওমর খৈয়ম— এবং বাইবেল। বর্তমান ক্ষেত্রে জিনিষটি আরো কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক, কারণ মূলের ও প্রতিরূপের রচয়িতা একই ব্যক্তি। যেন একই শিল্পী তাঁর বিশেষ অনুভূতিটিকে দুরকম ভঙ্গীতে আস্বাদন করতে চেয়েছেন— একটিতে রসায়ন হল উজ্জ্বল মধুর, আর একটিতে শান্ত মধুর। মাধুর্য শান্ত বলে যে কম প্রগাঢ় বা ক্ষীণপ্রাণ তা মনে হয় না— প্রখরতা তীব্রতা সব সময়ে নিবিড়তার পরিচয় দেয় কি?

ইংরেজী বিদেশী, আয়াসে আয়ত্তীকৃত ভাষা ব'লে, মাতৃস্তন্যের সঙ্গে স্বতঃ-আহৃত নয় বলেই হয়ত তাতে আত্মপ্রকাশের স্বৈরগতি অনেকখানি সংযত নিয়মিত হয়ে থাকবে, হয়ত বাধ্য হয়েই; কিন্তু বাধা অনেক সময়ে শিল্পীর পক্ষে সহায়ই হয়ে ওঠে— দোষ পরিবর্তিত হয়ে ওঠে গুণে। মাতৃভাষায় প্রেরণা সহজ সুলভ হয়, এসে যায় অতিশয্য এবং শৈথিল্য। বিদেশী ভাষা কিছু আয়াসসাধ্য বলেই তাতে দেখা দিয়েছে সেই সব গুণ স্বদেশী ভাষায় যা সম্ভব হয় নাই। বাংলায় রবীন্দ্রনাথের হল নির্ঝরের অজস্র অবাধ উচ্ছল প্রপাত— ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, গতির প্রাখর্য, বাক্যের সমারোহ তাঁর সৃষ্টিকে দিয়েছে একটা পরিপ্লাবনের শ্রী। কিন্তু ইংরেজীর কাঠাম তাকে যেন বাধ্য করেছে দুটি বাঁধা পাড়ের মধ্যে রয়ে চলতে, একটি পরিচ্ছিন্ন খাত, পরিষ্কার ধারা অনুসরণ করে। ইংরেজীর মধ্যে পাই একটা সুস্পষ্ট

দৃঢ়-রেখান্বিত গঠন, একটা নিয়মানুগ পারম্পর্য ও অঙ্গসাম্য, একটা সুষীম রূপবন্ধ। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ভাষায় বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের বাংলা কাব্যশ্রী হল প্রগল্‌ভা নায়িকা, আর তাঁর ইংরেজী কাব্যশ্রী হল ধীরা নায়িকা। আচ্ছা, শুনুন আর একবার—

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে র'ব মরি।

এর ইংরেজী রূপান্তর রসান্তর—

I dive down into the depth of the ocean of forms, hoping to gain the perfect pearl of the formless.

No more sailing from harbour to harbour with this my weatherbeaten boat. The days are long passed when my sport was to be tossed on waves.

And now I am eager to die into the deathless.

একটিতে tumult of the soul -এর বেশ রয়েছে বই-কি, আর একটিতে স্থিতধীর শান্তি, বুদ্ধির স্থৈর্য নেমে এসেছে।

২

প্রশ্ন রয়ে গেল ইংরেজী রবীন্দ্রনাথের, রবীন্দ্রনাথের নিজের দিক থেকে ছাড়া, ইংরেজী সাহিত্য, অর্থাৎ কাব্য হিসাবে কি সার্থকতা, কি মূল্য? বাংলায় তিনি একজন দিক্‌পাল স্রষ্টা—ইংরেজীতে সে পরিমাণ মর্যাদা ও মহত্ত্ব যদি নাই থাকে— তবুও সত্যকার অবদান তাঁর সেখানেও নাই কি?

বিদেশী ব'লে, আপনার মাতৃভাষার রাজ্য নয় ব'লে, কেউ যে সরাসরি কাব্যজগৎ থেকে বহিষ্কৃত প্রত্যাখ্যাত হবেনই তা নিয়ম নয়। আমরা জানি বিদেশীর হাতে সব ভাষাই অলংকৃত হয়েছে বিশেষ ভাবে। ইংরেজীতে Joseph Conrad এবং George Santayana সুপ্রসিদ্ধ। আধুনিক ফরাসীতে Jules Supervielle (স্পেনীয় ভাষা-ভাষী দক্ষিণ আমেরিকাবাসী হলেও) সুপ্রতিষ্ঠিত কবি। এ কথা সত্য, অবশ্য, এঁরা সকলেই নিজের মাতৃভাষা প্রায় পরিত্যাগ করে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত ও আত্মগত করে নিয়েছেন মাতৃভাষার মতন করেই। এঁদের সৃষ্টি তাঁদের ঐ এক অর্জিত ভাষার সহায়েই।

একাধিক ভাষায়—সাধারণ সাহিত্যরচনার কথা বলছি না—কাব্যরচনা, সুষ্ঠু কাব্যরচনা এবং সমান মূল্যের রচনা কেউ করতে পারেন কি না— এ একটা জিজ্ঞাস্য এবং তাতে মতভেদ রয়েছে। অন্তরের মর্মের ভাষা একই, একটি মাত্র ভাষাতেই নাকি অন্তরাত্মার প্রকাশ সম্ভব। ইউরোপে এক যুগে যখন লাতিন ভাষার সর্বব্যাপী প্রাধান্য ছিল তখন স্থানীয় কবিরা অনেকে স্থানীয় ভাষা ছাড়াও

লাতিনে সুকুমার সাহিত্য রচনা করতেন— মিলতনের লাতিন কবিতা বিশেষভাবে প্রশংসা অর্জন করেছে। ভারতবর্ষে আঞ্চলিক কবিরা সংস্কৃতেও কাব্য রচনা করেছেন—যথা, আমাদের বিদ্যাপতি ঠাকুর। উভয়ত্র সুন্দর সুষ্ঠু রচনা হয়েছে— কিন্তু সমান পদবীর হয়েছে কি না সন্দেহ।

তবে আধুনিক জগতে একটা অভিনব পরিবেশ গড়ে উঠছে। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা পরস্পরের এত নিকটে এসে গিয়েছে, পরস্পরের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান করে চলেছে যে আজকাল মানুষ (শিক্ষিত মানুষ ত বটেই) বহুভাষাভাষী (polyglot) হয়ে উঠছে। তিন চারটি ভাষা না জানা থাকলে আজকাল প্রায় কাজই চলে না। এরকম পরিস্থিতি যদি উত্তরোত্তর বেড়ে চলে তবে কবি সাহিত্যিকরাও কেন দুটি কি তিনটি ভাষাতেই সমান পারদর্শী হবেন না, তা জোর করে কেউ বলতে পারে না। মধুসূদন যে (ইংরেজী ও বাংলা) উভয় ভারতীর অর্চনা করে গিয়েছেন, হয়ত তিনি ভবিষ্যতের একটা অধিকতর সাধারণ ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবেই এসেছিলেন।

সে যা হোক, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাঁর ইংরেজী-সৃষ্টি বৃহৎ বা মহৎ না হোক, তা যে একটা বিশিষ্ট গুণের তাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজের কাব্যচেতনায়, কবিচিত্তে তিনি একটা নূতন অনুভব, নূতন রীতি এনে দিয়েছেন— এর কল্যাণে ইংরেজী যে লাভবান হয়েছে, সমৃদ্ধই হয়েছে তা স্বীকার করতে হবেই।

কবি পরিণতি

কবির আরম্ভ যেমন কৌতূহলের জিনিষ, কবির পরিণামও তেমনি কৌতূহলের—পরিণামই হয়ত বেশী চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। আরম্ভের আশা ভরসা, গুণধর্ম পরিণামে কি রকমে সমর্থিত উপচিত পরিপূরিত হয়েছে, কিম্বা পরিবর্তিত এমন কি পর্যুদস্ত হয়েছে, সে ইতিহাসের রহস্য জিজ্ঞাসুচিত্ত আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন—এ বিষয়ে আমরাও আজ কিছু দেখতে প্রয়াস করব।

শেক্সপীয়রের দিয়েই আরম্ভ করি—তাঁর উদাহরণ যেন সকল কবিপ্রাণের প্রতিকৃতি, তিনি যেন কবিকুলেরই প্রতিভূ। যাঁর আরম্ভ *Venus and Adonis* আর *The Rape of Lucrece* দিয়ে, তাঁর পরিণতি *Winter's Tale, Tempest*এ গিয়ে। শেক্সপীয়রকে যদি নমুনা হিসাবে গ্রহণ করি তবে কবির জীবনকে, হয়ত মানবজীবন মাত্রকেই, মোটের উপর তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথমে জোয়ারের আরম্ভ—যৌবনের ক্রমোদ্ভিন্ন উল্লাস, উৎসাহ উদ্দীপনা, প্রচুর হাসি-কান্না; তার পর জোয়ারের শেষে, মধ্য বয়সে, প্রৌঢ়ত্বের সূচনায় একটা প্রতিক্রিয়া, জীবনের সঙ্গে গাঢ়তর ও রূঢ়তর পরিচয়ের ফলে একটা বিপর্যয়ের ব্যর্থতার, বিষাদের কারুণ্যের অনুভূতি—শেক্সপীয়রের দ্বিতীয় যুগ, যাকে বলা হয় তাঁর আঁধারের, মহা ট্রাজেডির যুগ, তার পর শেষে ঝড়ের অন্তে একটা শান্তি ও সামঞ্জস্য, প্রসন্নতা

ও ক্ষমার পরিবেশ। প্রথম যুগে যৌবনবাগে রঙিন শেক্সপীয়র এই যেমন বলেছেন—

If music be the food of love, play on.
Give me excess of it, that, surfeiting,
The appetite may sicken and so die.
That strain again! It had a dying fall;
O, it come o'er my ear like the sweet sound
That breathes upon a bank of violets, ..

—*Twelfth Night* I I

দ্বিতীয় যুগের ঘন-ঘোর গুরু গাঢ় রুদ্রতার সঙ্কটের, সংগ্রামের লীলা—

Howl, howl, howl, howl! O, you are men of stones!
Had I your tongues and eyes, I'd use them so
That heaven's vault should crack...

-*King Lear* V. 3.

পরিশেষে একটা উপশমের, প্রশান্তির, প্রসন্নতার, প্রপত্তির, ক্ষমা ও প্রান্তির আবহাওয়া—

But this rough magic
I here abjure, and when I have requir'd
Some heavenly music—which even now I do—
To work mine end upon their senses that
This airy charm is for, I'll break my staff,
Bury it certain fathoms in the earth,
And deeper than did ever plummet sound
I'll drown my book.

—*Tempest* V...I

আব একজন কবিব কথা বলি—William Blake-এর দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। তবে ব্লেক দেখিয়েছেন দুটি পর্যায়ের দুটি জীবনের অবস্থান্তর বা বৈসাদৃশ্য। প্রথম জীবনে হল—যাকে তিনি বলেছেন Songs of Innocence—তাঁব কবিচিত্ত প্রস্ফুবিত হয়েছে সবলতাব শুচিতার অনভিজ্ঞতার মধুছন্দে—এ যেন শৈশবেব স্বচ্ছ স্বপ্নালু কল্পনা। কিন্তু বয়সের সঙ্গে ভোবের স্নিগ্ধতা পেলবতা শুভ্রতা মিশে যায—আসে ক্রমে পরিণত বয়সের খরবৌদ্র, হয স্বপ্নভঙ্গ, আসে কঠোব বাস্তবের, ঘাত-প্রতিঘাতের, কর্কশের, অসুন্দরের সঙ্গে পরিচয়। আদি মানব-মানবী নন্দনে যেমন ছিলেন জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদনের পূর্বে, আর যেমন হয়েছিলেন সেই ফল আস্বাদনের পরে। এই দ্বিতীয় পর্বের আত্মপ্রকাশকে কবি নাম দিয়েছেন Songs of Experience। শুনুন একটা Song of Innocence—

The moon like a flower
In heaven's high bower,
With silent delight
Sits and Smiles on the night.

কিম্বা এই আর একটি—

When the voices of children are heard on the green,
And laughing is heard on the hill,
My heart is at rest within my breast
And everything else is still.

এবার শুনুন বিপরীত বা বিস্বাদী বাগ, একটা Song of Experince, সেই পরিচিত বিখ্যাত—

Tiger! Tiger! burning bright
In the forest of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy symmetry?

অথবা—

The Rhine was red with human blood,
The Danube rolled a purple tide,
On the Euphrates Satan stood
And over Asia stretched his pride.

কিন্তু দ্বিতীয় ব্লেক প্রথম ব্লেকের বিপরীত নয়, পরিণত পরিপক্ক রূপ মাত্র, তারুণ্যের আতিশয্য, প্রৌঢ়তার দ্বন্দ্ব ও রুক্ষতার মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে চলেছে—

I know thee, I have found thee, and I will
not let thee go;
Thou art the image of God who dwells in
darkness of Africa,
And thou art fall'n to give me life in regions
of dark death,

কিন্তু বৈপরীত্য, একটা বিরুদ্ধতাই, দেখা দিয়েছে আধুনিক আইরিশ কবি ইয়েট্স্-এর মধ্যে।

বিষয়টি খুবই আলোচিত হয়েছে, বলা হয়েছে পর্যন্ত যে প্রথম যুগের ইয়েট্স্ই আসল ইয়েট্স্, শেষের ইয়েট্স্ ইয়েট্সের প্রেতমূর্তি। হয়ত এটি অত্যুক্তি। কিন্তু বৈসাদৃশ্য ও বৈপরীত্য যে বিশেষ প্রকট, তাতে সন্দেহ নাই। স্বপ্নের কল্পরাজ্যের আন্তর অনুভবের সূক্ষ্মদর্শী দিব্যদর্শী কবি, মধুচ্ছন্দ, মধুবাক তাঁর—

In all poor foolish things that live a day
Eternal Beauty wandering on her way.

কিম্বা—

The wrong of unshapely things is a wrong too great to be told
A hunger to build them anew, and sit on a green knoll apart,
With the earth and the sky and the water remade, like a casket of gold
For my dream of Your image, that blossoms, a rose in the deeps of my heart.

এই যে কল্পলোক, নন্দনকানন, আন্তর চেতনায় নিভৃত চিত্তের স্বর্গরাজ্য, কবির ভাষায় তাই হ'ল Innisfree, The Isle of Innisfree—কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের পরে, প্রায় বার্ধক্যের কি একটা বিপর্যয় ঘটে গেল তাঁর চেতনায়—একটা ঝড় এসে, কোন রূঢ় হস্ত এসে সে সব উড়িয়ে নিল, মুছে দিল। কবি হয়ে উঠলেন মাটির মানুষ, বাস্তবের অধিবাসী। তাঁর কণ্ঠ থেকে কি একটা যাদু উবে গেল, কবি নয় তিনি হয়ে পড়লেন বক্তা শুধু। এখন তাঁর বলতে লজ্জা হল না—

You think it horrible that lust and rage
Should dance attention upon my old age;
They were not such a plague when I was young,
What else have I to spur me into song?

সত্যই ত Songs of Innocence আর তাঁর কণ্ঠে নাই, কিন্তু

এসেছে সেখানে Songs of Experience এবং যতটা অকবির ভঙ্গিতে সাদা সহজ গলায় বলতে চেয়েছেন ততটা অকবি বা কর্কশ-কণ্ঠ তিনি হতে পারেন নি। এখনও তিনি সত্যকে সুন্দরকে চান, কিন্তু কল্পনাব মানস জল্পনার ফুলঝুকিময়, চান সত্য—হোক না তা রূঢ়তর সত্য, সুন্দরকেই চান—হোক না তা নিবাভরণ পেশীস্নায়ুর দৃঢ় অবস্থান—বলছেন ত—

Grant me an old man's frenzy,
Myself must I remake
Till I am Timon and Lear.
 Or that William Blake
 Who beat upon the wall
 Till truth obeyed his call...

তিনি এখন চান An old man's eagle mind, তাঁর দেশের নাম এখন আর Innisfree নয়, তা হ'ল Byzantium—ফলতঃ আমি মনে কবি যতই বৈসাদৃশ্য ও বৈপরীত্য থাক ইয়েট্‌সের এই দুটি পর্যায়ে, একটি আর একটির খণ্ডন নয়; পরিপূরক—একই জিনিষের দুটি পীঠ, অথবা সুমেরু-কুমেরু।

আর একজন কবি, কিন্তু সত্য সত্যই কবি-প্রেরণা কবি-চিত্তই হারিয়েছেন তাঁর উত্তর জীবনে। আমরা জানি মহাকবি ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ্ শেষ বয়সে লিখে গিয়েছেন পদ্যাকারে গদ্য—কাব্য নয়, কথামালা। কবি-চিত্তের এই ক্রম-অবনতি বা অস্তগমন তাঁর শেষ পৈঠায় চরমে পৌঁচেছিল একজন ফরাসী কবির মধ্যে—আর্থার র‍্যাঁবো (Arthur Rimbaud), অল্প বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয় (মাত্র

৩৭ বৎসর, যদিও কীট্‌স আরো অল্প বয়সে মারা যান—তবে কীট্‌সের কবিপ্রতিভা শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল)। কিন্তু তাঁর কাব্য-জীবন শেষ হয় কুড়ি বৎসর বয়সেই, তার পরে সরস্বতীর সেবা আর করেন নাই—যাপন করেছেন ভবঘুরের দীনহীন জীবন। সে যা হোক, আমাদের বিষয় হ'ল কবির কাব্য-পরিণতির কথা, কাব্য-বহির্ভূত জীবনের কথা নয়।

প্রশ্নটি এখন আমরা আমাদের রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তুলতে চাই। পূর্ব-রবীন্দ্রনাথ আর উত্তর-রবীন্দ্রনাথ বলে কিছু আছে কি? থাকলে কি ধরণের পার্থক্য তা? প্রথমত একটা জিনিষ দেখান হয়ে থাকে—ভাষার দিক দিয়ে। উত্তর-রবীন্দ্রনাথের ভাষা হয়েছে যথাসম্ভব সহজ, সরল, নিরলঙ্কার, সাজসজ্জাহীন—যথাসম্ভব মুখের ভাষা, সকলের ভাষা—পণ্ডিতের আলঙ্কারিকের পোশাকী ভাষা নয়, তা হ'ল দৈনন্দিনের আটপৌরে চলন-বলন। ভাবের দিক দিয়েও বলা হয়েছে পূর্ব-রবীন্দ্রনাথ হলেন যৌবনরসোচ্ছল, পার্থিব সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যের পূজারী, মাটির সন্তান—তিনি মাটির রসে মশগুল—স্বর্গে, ওপারে তিনি দৃষ্টি দিয়েছেন, কিন্তু তাতে জের টেনেছেন এই মাটির চোখেরই রঙরাগ। উত্তর-রবীন্দ্রনাথ ছড়িয়েছেন একটা ত্যাগের তপস্যার কঠিন-কঠোর না হলেও, একটা আত্মস্থ স্থৈর্যের সমাহিতির, বিরতির আবহাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের দুই পর্বে একটা বিভিন্নতা থাকলেও বৈপরীত্য কিন্তু কিছু নাই। এখানে উত্তরপদ পূর্বপদের সহজ স্বাভাবিক ক্রমিক পরিণতি মাত্র। রবীন্দ্রনাথ হলেন মুখ্যত মূলত মিলনের, সমন্বয়ের, সামঞ্জস্যের কবি। তাঁর চিত্ত, তাঁর অনুভব, তাঁর দৃষ্টি

সকল রকম দ্বন্দ্ব বা বৈসাদৃশ্যের মধ্যেই মিলনের সূত্র আবিষ্কার করে চলেছে। আশাভঙ্গের, নৈরাশ্যের, আত্মপ্রতিবাদের বা প্রত্যাখ্যানের বা বিমুখতার পর্ব এসে জীবনের ধারাবাহিকতায় ব্যাঘাত ঘটায় নাই। জীবনের মধ্যে এলেন তিনি; জীবনকে গ্রহণ করলেন সর্বাঙ্গ দিয়ে সর্বান্তঃকরণে, তার গুণগান গৌরবকীর্তন করলেন, তবে তার নিভৃত অলক্ষ্য উৎসের সঙ্গে সংযুক্ত রেখেই, সর্বদা সেই ও-পারের অপারের ভাবনাকেও ইহের এসবের মধ্যে অন্তঃসারী ফল্গুধারা হিসাবে নিহিত রেখে। তবে কালের ক্রম-পরিণাম-ধারায় এই অন্তঃপ্রবাহের স্বরই প্রকট হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, কিন্তু পুরাতন পূর্বতনকে প্রত্যাখ্যান করে নয়। জীবনের অন্তে পৌঁছলেন যখন সহজ স্বাভাবিক গতিচ্ছন্দে, যেসব বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, সাগ্রহে পরিচয় দিয়েছিলেন, তাদের থেকে সবে চলে যাবার পালা এল, তখন দুঃখ, ক্ষোভ বা অনুযোগ বা বিরোধী ভাব কিছু নাই। পরিবর্তন যদি হয়ে থাকে তবে হয়েছে কতকটা এই ধরণের—আদি জীবনে যে তারটা ছিল সরু, শেষ জীবনে তা মোটা হয়েছে—আর যে তার ছিল মোটা, তা শেষে হয়েছে সরু—মুখ্য যা ছিল তা হয়েছে গৌণ, গৌণ যা ছিল তা হয়েছে মুখ্য। বয়সের ফলে কণ্ঠে পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু স্বর বদলালেও সুর বেশী কিছু বদলায় নাই। পরিবর্তন হ'ল পরিণতি ও পরিপক্বতা। যা ছিল উজ্জ্বল তা হয়েছে গাঢ়, যা ছিল ভাবাবেশ তা হয়েছে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, যা ছিল অভিরূপভূয়িষ্ঠ তা হয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক—ভরা ভাদরের পরে এ যেন, কালিদাসীয় উপমায়, তনুগাত্রযষ্টি শারদশ্রী। কবিচিত্তের এই ক্রমধারা অনুসরণ করি প্রথম পর্বে, প্রভাত সঙ্গীতে—

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া
দিব যে পরান ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর।
—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

তার পর দ্বিতীয় পর্ব, ভাবোচ্ছ্বাস যখন গাঢ় হয়েছে, তারল্যের পরিবর্তে এসেছে নিবিড়তা, কণ্ঠে উদাত্ত গাম্ভীর্য, ভাবে গভীরতা—

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী!
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা—

মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।

—উর্বশী

তৃতীয় পর্ব, যাকে বলা যায় কবিচিত্তের পরিপূর্ণতা, পূর্ণাঙ্গতা, রবি-পরিক্রমার মধ্যাহ্ন-স্থিতি যেন—স্থিতির সঙ্গে গতির, গাঢ়তার সঙ্গে নমনীয়তার, দৃষ্টির সঙ্গে অনুভূতির সাযুজ্য মিলন হয়েছে—কেন্দ্রমুখী ও কেন্দ্রবিমুখী প্রেরণা সাম্য লাভ করেছে—

হে হংসবলাকা
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নৈঃশব্দ্যের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ-পরে ঝাপটিছে ডানা,
মাটির আঁধার-নীচে, কে জানে ঠিকানা…

—বলাকা

অথবা,

খোল খোল হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে
গোধূলি বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে

লয়ে তার ভীরু দীপশিখা,
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা॥…

—পূরবী

তার পর চতুর্থ পর্বে—সব শেষের গান—কণ্ঠ প্রশান্ত পরিচ্ছন্ন অনুদাত্ত কোমল হয়ে চলেছে পরম নিবৃত্তির মধ্যে মিলিয়ে যাবার পথে যেন—পরম নিবৃত্তি কিন্তু যার মধ্যে, আমি ইতিপূর্বে বলেছি যেমন, সকল বৃত্তিই আশ্রয় নিয়েছে, সংহত সংবৃত হয়ে, স্বরূপের সার্থকতার মধ্যে—

পথরেখা লীন হল অস্তগিরিশিখর-আড়ালে,
স্তব্ধ আমি দিনান্তের পান্থশালা দ্বারে,
দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে…
শেষ তীর্থ-মন্দিরের চূড়া!
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী
যার মূর্ছনায় মেশা এ-জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে—নহে দূর, নহে বহুদূর।

কবি-পরিণামের আর এক ধারা আছে—সেটি এখানে উল্লেখ করতে পারি মাত্র। কবিত্বের ক্রমগতি যেখানে অর্ধ-অবগমন বা অস্ত-গমন নয়, নিম্নাভিমুখী গতি নয়, সমতলবর্তী গতিও নয়—যা হল ঊর্ধ্বায়ন অর্থাৎ কবি আর শুধু কবি নন, হয়ে উঠেছেন ঋষি, মানুষী বাক্ ছাড়িয়ে কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন দৈবী বাক্—কারণ তাঁর

চেতনা ও চিত্ত হয়ে উঠেছে অনুরূপ—উদাহরণ শ্রীঅরবিন্দ। মানুষী কবিকণ্ঠ শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে আদিপর্বে বলেছে—

Are we more than Summer flowers ?
Shall a longer date be ours ;
Rose and Spring-time, Youth and we
By the everlasting Sea ?

এ সার্বজনিক সমস্যার উত্তর দিব্য কবিকণ্ঠ—

In the ending of time, in the sinking of space
What shall survive ?
Hearts once alive,
Beauty and charm of a face ?
Nay, these shall be safe in the breast of the One
Man defied
World-Spirits wide
Nothing ends; all but began

প্রথম যৌবনের ভাবন ও ভাষণ প্রতিফলিত এই যে কথায় তিনি শেষ করলেন তাঁর 'উর্বশী'—

...So pressing back
The longed-for sacred face, lingering he kissed.
Then love in his sweet heavens was satisfied.
But far below through silent mighty space
The green and strenuous earth abandoned rolled

উর্বশী-পুরূরবার মিলন হ'ল, প্রেমের সার্থকতা হ'ল—কিন্তু এই মর পৃথিবীতে নয়, আর এক ঊর্ধ্বতর লোকে—বেচারী পৃথিবী পড়ে রইল যে তিমিরে সে তিমিরে। একটা নিবিড় মানুষী কারুণ্য,

পার্থিব সাধ আশা আকাঙ্ক্ষা যে অর্ধস্ফুট দীর্ঘশ্বাসের ভিতর দিয়ে ফেটে পড়ছে। কিন্তু মানুষী কামনার দীর্ঘরজনী শেষ হবে, শেষ হ'ল একদিন—পৃথিবী আর অসহায়ভাবে পরিত্যক্ত রইল না। 'সাবিত্রী'র ঋষি-কবি দিব্যবার্তা আনলেন, বার্তা শুধু নয়, দিব্য-সিদ্ধি এনে ধরলেন মানুষের পৃথিবীর কাছে, 'সাবিত্রী'র আরম্ভে এই অমর বাণী দিয়ে—

It was the hour before the gods awake...

সময় হয়েছে, দেবতারা জাগছে—ঊর্ধ্বলোক থেকে, তাদের নিজেদের স্বর্গ থেকে দেবতারা নেমে আসছে এই ভূতলে মানুষী রূপ ধারণ করে, এই মর্ত্যলোকের মানুষও ঊর্ধ্বের চেতনায় পূর্ণ হয়ে দেবতার রূপ ধারণ করেছে—নবসৃষ্টির এই ত নব জাতি—রূপান্তরিত প্রকৃতি এসেছে যাদের কল্যাণে—

The Sun-eyed children of a marvellous dawn.
The great creators with wide brows of calm,
The massive barrier-breakers of the world

...

The architects of immortality

Their tread one day shall change the
suffering earth
And justify the light on Nature's face.

রবীন্দ্রনাথের উত্তরপক্ষ

রবীন্দ্র-চেতনা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে চেতনা বা মনোভাবের প্রতীক বা বিগ্রহ ছিলেন তা বিরোধেরও উদ্রেক করেছিল যথেষ্ট। এ স্বাভাবিক। যাঁরা স্রষ্টা বা বিভূতি, যাঁরাই একটা শক্তিমান বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন, চিরকাল তাঁরা তাঁদের শক্তির পরিমাণেই আবার প্রতিবাদ জাগিয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধ থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ অবধি সকলেরই এ দুর্যোগ ভোগ করতে হয়েছে। এ বুঝি নিউটনীয় দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার উদাহরণ!

অবশ্য প্রতিপক্ষের প্রয়োজন আছে, বিশেষ প্রয়োজনই আছে, প্রকৃতির ব্যবস্থায় ও মানুষের অবস্থায়। প্রতিপক্ষই বৈশিষ্ট্যকে তার সীমা এঁকে আরো প্রস্ফুট করে ধরে। কোন কোন দার্শনিকেরা যেমন বলেন অনাত্ম দিয়েই আত্মার সম্যক পরিচয় ও প্রমাণ। আমি যা নই তা-ই ফুটিয়ে ফলিয়ে জোরালো করে ধরে আমি যা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ করে যে কয়েকটি ধারা দেখা দিয়েছিল তা থেকেই স্পষ্টতর বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য।

আদিযুগে একটা প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রমুখ এক গোষ্ঠী। বিরোধের বাহ্যরূপ ছিল অর্থের অস্পষ্টতা এবং ভাবের বিলাস এই দুয়ের বিরুদ্ধে আপত্তি। প্রথমতঃ অর্থের অস্পষ্টতা—এই যেমন 'সোনার তরী'—এ হল mystic, mystifying, অর্থশূন্য, কথার ঝুরি মাত্র। বাঙালী কবির

বৈশিষ্ট্য (পূর্বতন সকল যুগেরই বৈশিষ্ট্য হয়ত) হল সুস্পষ্টতা, বাক্যের অর্থের অসংদিগ্ধতা, বুদ্ধিগ্রাহ্যতা—বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে ভারতচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্ত দীনবন্ধু দাশরথি অবধি সর্বত্র প্রসাদগুণ একান্ত-স্বচ্ছতাই আমাদের কবিদের মুখ্য গুণ। রবীন্দ্রনাথ আনলেন আর এক জিনিষ, চিন্তাজগতে কুয়াসা। বাংলার কাব্যে এরকম অস্পষ্টতা যে নেই তা নয়, রয়েছে—বৌদ্ধ দোঁহায়, চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদে বা বাউল প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সাধকদের গীতে। রয়েছে একটা অবোধ্যতা বা অস্বচ্ছতা, সেটি প্রহেলী হতে পারে কিন্তু কুহেলী নয়—অর্থাৎ সেখানে হল পারিভাষিকের কথা, সেখানে রয়েছে রূপকের দ্ব্যর্থতা—যেমন বৈদিক ঋষিদের বাক্য, তাতে সংশয়ের ধোঁয়া নাই, স্পষ্ট অর্থের উপর একটা আবরণ মাত্র আছে, ইচ্ছা করে তা দেওয়া হয়েছে, সে-আবরণ সরালেই, পারিভাষিকের অর্থ আয়ত্ত করলেই, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মধ্যেই রয়েছে একটা যেন শৈথিল্য, গঠনের মধ্যে দৃঢ়তার অভাব। এর হেতুই হয়ত দ্বিতীয় বিশেষত্ব—ভাবের বিলাস। ভাবের বিলাস অর্থ কেবল ভাবের উচ্ছ্বাস নয়, ভাবের আবিলতা। ভাবে শুধু বিশৃঙ্খলা নয়, আছে মালিন্য। দ্বিজেন্দ্রলাল এই জিনিষটির উপর বিশেষ বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথে প্রেম, বৈষ্ণবী প্রেমও মানুষী লালসায় জর্জরিত, পাশব ক্ষুধার প্রবেগে উত্তপ্ত। উত্তরকালে একজন কবি সমালোচক (মোহিতলাল মজুমদার) এই ধারায় আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'র শবচ্ছেদ করে দেখিয়েছিলেন যে উর্বশী স্বর্গের অপ্সরা বা আমাদের আন্তর জীবনের কোন আদর্শ নয়, তা হল ইউরোপীয় ভিনস দেবীর ভারতীয় নটীর ছদ্মবেশ। ফলতঃ এই

কথাটি বলা হয়েছিল যে, সমস্ত 'রবীন্দ্রিয়ানা'-ই হল বিদেশী বিলাতী রোমান্টিক ভাববিলাসিতার বিকৃত প্রতিবিম্ব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যুগেও হেঁয়ালিমুক্ত সুস্পষ্ট চেতনার কবি যে দেখা দেন নি তা নয়—উদাহরণ হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র।

অনুভবের অনুভূতির এই অস্পষ্টতা বা সন্দিগ্ধতা দোষ আর এক দিক দিয়ে গুরুতর প্রত্যবায় হিসাবেই দেখিয়েছেন আর এক প্রতিপক্ষ—বিপিনচন্দ্র পাল বিশদভাবে, খুব স্পষ্ট করে ধরে দিয়েছেন। আমার মনে হয় এই মনীষীই সর্বপ্রথম 'বস্তুতন্ত্র' কথাটি সাধারণ সাহিত্যে চলিত করেছেন। বিপিনচন্দ্র বলছেন রবীন্দ্রনাথে সত্যের—আধ্যাত্মিক সত্যেরও—সাক্ষাৎ উপলব্ধি নাই। ঋষিদের যে সিদ্ধি ব্যক্ত হয়েছিল তাঁদের এই মন্ত্রে—জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সূর্যকে যেন আমরা দেখতে পারি—রবীন্দ্রনাথে সে কূটস্থ উপলব্ধি নাই; তাঁর আছে জিজ্ঞাসুর তটস্থ অনুভব। রবীন্দ্রনাথে সত্য বস্তু নয়, তা হল ভাব—সাক্ষাৎ দৃষ্টি নয়, তাঁর প্রেরণার উৎস কল্পনা, হৃদয়ানুভব—কায়া তিনি দেখেন নাই, তিনি দেখেছেন ছায়া। সাক্ষাৎদৃষ্টির এক কি দুই ধাপ নীচে রয়ে গিয়েছে তাঁর আবেশানুভব। তাই তাঁর সৃষ্টি সুস্পষ্ট সুষীম হয় নাই দিবালোকে জাগ্রত চেতনার দৃষ্টির মতো। রবীন্দ্রনাথে পাই সূর্যের খরদীপ্তি নয়, চন্দ্রের মধুর মৃদুল আলেপন এবং যত সুন্দরই হোক না তা হল borrowed majesty—গৌণ, 'পরস্মৈপদী' মহিমা। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভব উপলব্ধি সব মানস রচনা, বুদ্ধির কবিত্বময় ব্যাখ্যা—তা আর্ষবাক্ নয়।

ঋষির ধরণ যেমন তাঁতে নাই, ঋষির বস্তুও তাঁতে হ্রস্বতা লাভ

করেছে। বৈদিক ঋষিরা যে-জগৎ দেখেছিলেন, অধ্যাত্মজগতের বহুলবিচিত্রতাময় একটা বিশ্বসৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মচেতনায় তা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আধুনিক বুদ্ধির হিরণ্ময় পাত্র বৈদিক বিশ্ব-দেবতাকে স্বীকার করতে পারে নাই, তাকে সংযত সংক্ষিপ্ত করে একমদ্বিতীয়মে আবদ্ধ করেছে। যে চেতনা পরম সত্যকে পিতা বলে অনায়াসে গ্রহণই করেছে তার মাতৃরূপ গ্রহণে ততটা তৎপর হয় নাই; আদি ঋষিদের দৃষ্টি ছিল সমন্বয়মুখী উভয়পদী—তাঁদের মন্ত্র দ্যৌর্মে পিতা মাতা পৃথিবীরিয়ং। উত্তরপক্ষেরা তাই এখানে বলেন, রবীন্দ্রধারা ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসে পৌঁছিতে পারে নাই, বেদ নয়, তা আরম্ভ করেছে বেদান্ত বা উপনিষদ হতে এবং পরিপুষ্ট হয়েছে বৌদ্ধ ভাবে—সে-সিদ্ধান্ত অনেকখানি প্রভাবান্বিত আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও খৃষ্টীয় হাবেভাবে।

চিত্তরঞ্জন তাই একদিন ক্ষুব্ধচিত্তে উচ্চকণ্ঠে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়ে-ছিলেন—তাঁর মতে সমস্ত রবীন্দ্রনাথই হল মূর্ত ফিরিঙ্গিয়ানা, পরাধীন ভারতের দাসসুলভ পরানুচিকীর্ষা। ম্লেচ্ছ শিক্ষাদীক্ষায় আমরা কতদূর ভ্রষ্ট তার পরিচয় রবীন্দ্রসাহিত্য—ভারতীয় খোলস আছে এখানে-ওখানে কিন্তু সেই খোলসের ভিতর দিয়ে ফেটে বের হয় বৈদেশিক বৈধর্মিক আকার-প্রকার। এই যেমন রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-ভাবের নানা চিত্র এঁকেছেন, হঠাৎ দেখলে মনে হবে খাঁটি জিনিষই এসব, কিন্তু যদি একটু তলিয়ে এবং নজর করে দেখা যায় তবে স্পষ্ট ধরা পড়বে তাদের নকল রূপ। চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির আসল গৌড়ীয় রূপও নাই, রসও নাই।

এই গেল সব গোঁড়াদের, পুরাতনপন্থী বা স্থিতিশীলদের

অভিযোগ। কিন্তু মনে হয় সকলের চেয়ে বড় আঘাত রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন আধুনিকদের দিক থেকে—বলা হয়েছে মোটের উপর যে তিনি যথেষ্ট আধুনিক নন, তিনিও একজন সনাতনী। এক্ষেত্রে তাঁকে দু'দিক থেকে আক্রমণ করা হয়েছে, এক ভাবের যা বিষয়বস্তুর দিক হতে, আর-এক ভাষার, বা প্রকাশভঙ্গীর দিক হতে। বলা যেতে পারে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীই আকার দিয়েছেন কণ্ঠ দিয়েছেন এই প্রতিবাদকে। এই প্রতিবাদকারীদের আর-এক নাম হল অতি-আধুনিক—তাঁদের হল জনগণের বার্তা (vox populi)। নব-জাগ্রত গণদেবতার পূজারীরা বলে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ হলেন 'পোশাকী' কবি, কিন্তু আমরা আজ চাই 'আটপৌরে' মানুষ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন অভিরূপভূয়িষ্ঠদের কথা অর্থাৎ বড়লোকদের পদস্থদের উচ্চশ্রেণীদেব কথা, তাদের মনোবৃত্তি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেরণা-আদর্শ, তাদের অবস্থা-ব্যবস্থা এবং তাদের মুখের ভাষা। শেক্সপীযব বা মিলতন, বাল্মীকি কি কালিদাস যে সমাজের, যে সামাজিক বৃত্তি বা ভঙ্গীব প্রতিনিধি তা বর্তমান জগতে অচল—আজ চাই চতুর্থ বর্ণের এমন কি পঞ্চম বর্ণের বাণী, সমাজের নিম্নতম স্তরে যারা, দীন দুঃস্থ অজ্ঞ সবহারাদেব বার্তা হবে সাহিত্যের উপজীব্য। এই অধিকাংশ মানবজাতির যে অমাজিত অসংস্কৃত রূঢ় অথচ স্বাভাবিক জীবন্ত ভাব ও ভাষা তাকে অপাংক্তেয় করে রাখা আর যায় না—তাদেরই দিতে হবে কৌলীন্য। আব বলা চলবে না—

মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি
সখি জাগো সখি জাগো।

'মেলি রাগ-অলস আঁখি
সখি জাগো সখি জাগো—

এই বুর্জোয়া ঢঙ ও সঙ, এই বড়লোকী ভাবের ও ভাষার বিলাসিতা ছিঁড়ে খুলে দূরে ফেলে দিতে হবে, যথা বাসাংসি জীর্ণানি। আজকালকার কথা ও রীতি হল—

চোরা বাজারে দিনের পর দিন ঘুরি
সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে,
খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি
মাঝে মাঝে ক্লান্তভাবে কি যেন ভাবি—
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি—

—সমর সেন

বলা বাহুল্য এসবই হল অন্যায় যুদ্ধ, বিকৃত দোষারোপ। মানুষকে বিচার করতে হবে, তার মর্যাদা নিরূপণ করতে হবে, সে কি তাই দিয়ে, সে কি নয় তা দিয়ে নয়। আমি কি করতে পারি নি, কি করি নি, তা দিয়ে আমার মূল্য স্থির হবে না, ওজন করা হবে না। আমি কি করেছি তাই হল আমার সত্যকার পরিমাপ। শেক্সপীয়র কোন্ জগৎ এনেছেন, মিলতন কোন্ লোক গড়েছেন, রবীন্দ্রনাথ কোন্ সৃষ্টিকে রূপ দিলেন, তাই দিয়ে এঁদের পরিচয় গ্রহণ করব—এঁরা কোন্ জগৎ কোন্ সৃষ্টি গড়েন নাই, তা হল অবান্তর। আর যাঁরা কিছু গড়েন, তা গড়েন নিজের মতন করে—অন্যের সৃষ্টি অন্যের সিদ্ধান্ত তাঁকে উপকরণ দিতে পারে তাঁর নিজস্ব ব্যবহারের

জন্যে, কিন্তু তিনি যে সেসব হুবহু স্বীকার করবেন গ্রহণ করবেন এমন কিছু বাধ্যবাধকতার বশীভূত তিনি নন। প্রত্যেকের সত্য, প্রত্যেকের দৃষ্টি, প্রত্যেকের অনুভূতি তার নিজস্ব ধরণে—অপরের সঙ্গে পার্থক্য বা সাদৃশ্য বা ঔদাসীন্য হল শিল্পীর পক্ষে রঙ যেমন, সেসব খেলিয়ে ধরে শিল্পীর হাতের গুণ। শুধু দেখতে হবে, মানুষটি নিজে যা তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সে চলতে পারে কি না, যে-সত্যকে যে-উপলব্ধি অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন ব্যক্তিবিশেষে তা তিনি পেরেছেন কি না, নিজের সঙ্গে নিজে তিনি সত্যসন্ধ কি না।

আর-এক জনের সিদ্ধি ও শক্তি আমার মধ্যে হুবহু প্রতিফলিত প্রতিবিম্বিত হল কি না তা আমার পরিচয় নয়। স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে গল্প আছে যে তাঁর উপর মাদ্রাজী গোঁড়া-পণ্ডিতেরা দোষারোপ করেছিল এই যে, শঙ্করাচার্য যা বলে গিয়েছেন তা তিনি বলছেন না, উত্তরে বিবেকানন্দ বলেছিলেন "শঙ্কর বলেন নাই-ই হয়ত, কিন্তু আমি বিবেকানন্দ, আমি বলছি।" সমস্ত কথাই হল, যিনি স্রষ্টা বা দ্রষ্টা হিসাবে গৃহীত তিনি প্রতিভার, বিভূতির বা অবতারকল্প পুরুষের অধিকার নিয়ে এসেছেন কি না—রামকৃষ্ণের ভাষায়, তকমা তাঁর মিলেছে কি না। সব কবিই, ঋষি বা সিদ্ধেরা পর্যন্ত, পূর্বতনদের নমস্কার জানিয়েছেন—তাঁদের বস্তু বা ভাব বা ভঙ্গী অনুকরণ অনুসরণ ও আত্মসাৎ করেছেন—এই আত্মসাৎ করাই সব রহস্য। আত্মসাৎ করা যায় আবার বিরোধিতার ভিতর দিয়েও। নিজের মধ্যে এমন দিব্য-জ্যোতি দিব্য-অগ্নি প্রজ্বলিত কি না যা সব রকম উপাদান গ্রহণ ক'রে, কোথাও দ্রবীভূত ক'রে, কোথাও ভস্মীভূত ক'রে তাদের সার নিজের সত্তার মধ্যে একীভূত ক'রে

নেয়, আপনারই বিগ্রহ ক'রে আবার রূপ দিয়ে বাহিরে প্রকাশ করে।

যে মানুষ অর্জন করেছে একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, যে অধিকার করেছে স্বভাব ও স্বধর্ম, তার সৃষ্টির মাপ তার নিজের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের চেতনা কি কি উপাদান সংগ্রহ করেছে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা হতে, আর কোন্ কোন্ উপাদান ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে, দেশীয় কোন্ কোন্ ভাবধারা হতে তাঁর চ্যুতি ঘটেছে, আর কোন্ কোন্ ভাবধারার সঙ্গে তাঁর সুম্মিলন হয়েছে, এসব ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের বিষয় হতে পারে। কিন্তু তা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির দিক থেকে, মান-অপমানের নিন্দা-প্রশংসার বিষয় হতে পারে না। শেক্সপীয়র অনেক কিছু দেশজ বিধান, শিষ্টসম্মত রীতি ভেঙেচুরে দিয়েছিলেন, নেপোলিয়নও প্রাচীন নিয়মকানুনের উপর দিয়ে তাঁর দুর্বার রথচক্র চালিয়ে দিয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথও যদি অনুরূপ কিছু করে থাকেন তবে আমাদের অনুযোগ করবার কিছু নাই। বিপরীতপক্ষে তিনি যদি আবার যথেষ্ট মাত্রায় কালাপাহাড় না হয়ে থাকেন তাতেও দোষারোপ করবার অধিকার আমাদের নাই। বলেছি দেখতে হবে, তিনি নিজস্ব একটা অখণ্ড পরিণত জিনিষ দিয়েছেন কি না, এমন একটা রসময় সত্য বিশ্বের নিরপেক্ষ চিত্ত, যেখানে—

আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

রবীন্দ্রনাথে তুমি ও আমি

এক প্রান্তে

তুমি হে কেবল, প্রভু, তুমি হে কেবল

অন্য প্রান্তে

অয়মহম্ ভোঃ—

এক প্রান্তে তুমিই শুধু আছ, আমি নাই, আমি তোমাতে লয় পেয়েছি, অন্য প্রান্তে আমিই শুধু আছি, তুমি আমার মধ্যে লয় পেয়ে গিয়েছ। এই দুই প্রান্তের মাঝখানে তুমি ও আমি আছি নানা পরিমাণে ও নানা ঢঙে, সুতরাং নানা সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে।

রবীন্দ্রনাথে এই দুইটির সম্বন্ধ ও সম্বন্ধ-ক্রম চমৎকার একখানা ছবি আমাদের মানসপটে রচনা করে এবং অনেকখানি জ্ঞান আমরা তা থেকে পাই। গোড়ায় সমুচ্চে—চেতনার গোড়ায় ও সমুচ্চে—আমরা পাই বৈদান্তিক অদ্বয় ও অদ্বিতীয়—ওঁ তৎ সৎ, সেই শুধু আছে, অর্থাৎ তুমি। তাই ত ঔপনিষদ মন্ত্র প্রতিধ্বনিত ক'রে তিনি বলেছেন—

তোমার হোমাগ্নি-মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি
তারে নমো নমঃ।

সোঽহমস্মি—সেই ত আমি; আমার যে সত্য-সত্তা তা তুমি। এ হল অন্তরাত্মার চেতনার তুরীয় স্থিতির সিদ্ধান্ত—কিন্তু প্রাণে ও দেহে অনুরূপ অনুভূতি যখন নেমে আসে, বৈষ্ণবীয় পূর্ণ প্রপত্তি বলে তখন—

……আত্মহারা।
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে

কিম্বা—

আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে
তোমার ইচ্ছা কর হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে

অথবা—

যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্মদলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে॥

বৈষ্ণব কবি যেমন বল্লেছেন রাধা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণই যেন হয়ে গেলেন। এ হল পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি, কেবল তুমি। কিন্তু এই তুমির মধ্যে ধীরে ধীরে আমির আবির্ভাব হয়—নতুবা লীলা কি? সাধক তাই বলছেন, না, চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে চাই। প্রপত্তির প্রথম পৈঠা তবে হল—

আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো—

তুমিই আছ, আর আমিও আছি কিন্তু তোমার অনুগত হয়ে, তোমার প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া হয়ে, তোমার করণ-উপকরণ হয়ে। সত্যকার আমি তাই—সাধকেরা যাকে বলে থাকে "পাকা আমি"। এই ভাবের ভাবুক হয়ে কবি তখন বলেন—

আমার যে সব দিতে হবে, সে তো আমি জানি
আমার বলে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার করে দেব, তখন তারা আমার হবে।

আমি, আমার সত্যকার অস্তিত্ব, আমার ধর্ম-কর্ম কৃতিত্ব সব তদ্‌গত বা ত্বদ্‌গত, তোমারই প্রকাশ ও মহিমা—যেন আমি একান্তভাবে জানি, উপলব্ধি করি—

মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।

এ কথা নিশ্চয় সত্য, মূল আদি সত্য, সন্দেহ নাই—

অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের।

তবুও কথা আছে—অহংকার নয়, এই যে আমি তা তুমি, তুমি হয়েছ বা এসেছ আমি হয়ে, তোমার আপন প্রয়োজনের বা আত্মরঞ্জনের জন্য—পরাশক্তির এই ত হ্লাদিনী শক্তি অর্থাৎ যাকে আশ্রয় করে আনন্দের লীলা। কারণ নিজ সত্তায় তুমি অকায়ং অব্রণং নিত্যজ্যোতিঃ তমসঃ পরস্তাৎ। তার মধ্যে যখন আমি-প্রত্যয় জাগে তখনই ত সৃষ্টি, বহিঃপ্রকাশ—তুমি নিজে অসীম, কিন্তু

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর ;
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ;
তোমার আলোয় নাই ত ছায়া ;
আমার মাঝে পায় সে কায়া—

এই কথাই ঘুরিয়ে কবি বলছেন—

আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান—

এ পর্যন্ত একে বলতে পারি আমি তুমির প্রায় সমান ভাগাভাগি, সমান মর্যাদা—কিন্তু এর পর থেকে আমির দাবি বেড়ে যায়—যত আমরা চলি পৃথিবীর দিকে, মানুষী ভাবের দিকে—পদস্খলনের প্রথম পদে বলে উঠি, 'আমি'র স্ব-তন্ত্র মহিমা গেয়ে—

তুমি মোরে চাও যবে অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জেগে—

'অব্যক্তের অখ্যাত আবাস', এই দৃঢ়, প্রায় রূঢ় পরিভাষায়, কবি দিয়েছেন সৃষ্টির প্রাক্কালের চিত্র। অবশ্য বৈদিক ঋষিরাও ঐ জাতীয় মন্ত্র দিয়েছেন—তমো আসীৎ তমসা গূঢ়ং অগ্রে—সেটি হল অচেতনার মহাসাগর, তার মাঝে প্রথম জাগল কামনা অর্থাৎ অহং। বৈদিক ঋষিরা এখানে উপর থেকে, ব্রাহ্মীচেতনা থেকে সৃষ্টি বা প্রকাশের কথা বলছেন না—বলছেন নীচের সৃষ্টির কথা, অবচেতনা থেকে স্থূলের বা পৃথিবীর জন্মকথা। আমাদের বাক্যটির সমগোত্র মিলবে হয়ত আধুনিক একটা চিন্তাধারায়, আধুনিক পাশ্চাত্যে যাকে নাম দেওয়া হয়েছে Existentialism (বলি, ভবতি-বাদ)। দুই রকম

অস্তিত্ব আছে—এক শুদ্ধ 'অস্তি' আর এক 'ভবতি'। অস্তি অর্থ প্রায় নাস্তি, কারণ তাই হল 'অব্যক্ত অখ্যাত', অচেতন নিশ্চেতন, শূন্যপ্রায়। আদি নিস্তরঙ্গ স্থির শূন্যে ঢেউ ওঠে যখন তখন সৃষ্টি, প্রকাশ—প্রত্যেক ঢেউ হল 'আমি'। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে এ রকম কথা আছে—তবে এক বৌদ্ধবাদ ছাড়া আদি অব্যক্তকে শূন্য কেউ বলে নি, তাকে প্রাধান্য দিয়েছে অচেতনা নয়, পরাচেতনা ব'লে এবং সকল আমিকে তারই অঙ্গ ক'রে, বা তারই মধ্যে ডুবিয়ে মিলিয়ে রেখেছে। তাই ত সে বলতে পেরেছে প্রাণের আবেগে—

তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমাওয়ত

কিন্তু পাশ্চাত্যের ভবতি-বাদের যে বৈশিষ্ট্য তা হল তার 'আমি'ত্বের বৈশিষ্ট্য। এই আমি জন্মেছে তার নিলয় বা জন্মস্থান, তার পট-ভূমিকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাকে পায়ে ঠেলে যেন তার অসীম সমতার উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে আপন বৈষম্য প্রকট করে, একটা স্বাতন্ত্র্য যার অর্থ একান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষুধা তা নিয়ে। এই যে তত্ত্ব মানুষের দেহে প্রাণে এবং মনে যখন রক্তমাংস নিয়ে শরীরী হয়ে ওঠে—যেমন, মানুষী প্রেমের আবেগ, তখন সে আর সৌম্যা থাকে না, হয় রুদ্রা—মহালক্ষ্মী নয়, মহাকালী। রাধা তখন বলে ওঠেন—

শুন মাধব রাধা স্বাধীনা ভেল

তখন শুরু হয় একান্ত মান-অভিমানের পালা অর্থাৎ অহমিকার বিচিত্র অভিরাম বিপরীত লীলা। মান-অভিমানকে প্রেমের লীলায় আমরা খুব বড় স্থান দিয়েছি—প্রেমের পরম সৌন্দর্য বলেই একে

আমরা গ্রহণ করি—কিন্তু আসলে এ হল অহমিকার চরম প্রকাশ। এ লীলার প্রথম ও একমাত্র সূত্র হল আমির মূল্য ও মর্যাদা, তুমি হয়ে গেলে আমির দাস সেবক—ভগবান সত্য সত্যই ভক্তের দাস হয়ে পড়লেন, একটা তামস অর্থে নয় কি? পরানুরক্তি নিয়ে রাধিকা বলেছিলেন—হামার গরব তুহুঁ বঢ়াওয়ল—কিন্তু এখন তাঁকে বলতে হবে, তোমার গরব হমে বঢ়াওয়ল। আমি ছাড়া তোমার আর গতি নাই, তাই ত প্রেমের এই দাবি—

তুমি ত ভালো বেসেছ আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হবে ভালো।

কারণ তুমি ত আর নাই, আমিই হয়ে গিয়েছ—ভগবান, পৃথিবীতে যখন নেমেছ তখন ত তুমি এই মাটিই হয়ে গিয়েছ—

তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ
আমারি জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো।

ভক্তের মধ্যে ছাড়া ভগবানের আর বাঁচবার স্থান নাই। কবি তাই স্পষ্টই বলছেন দার্শনিক তত্ত্বের রূপ দিয়েই—

মানুষের অহংকার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প…

কারণ,

ওদিকে অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়
তাকেই বলি আমি।

এই ভাবের ভাবুক হয়ে, মানুষী প্রেমোন্মাদের মতই, ভগবানকেও উদ্দেশ্য করে বলা যেতে পারে অহমিকাকে একটা স্নিগ্ধশ্রী পরিয়ে দিয়ে—

যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে[১]

এ হল 'আমি'র দেবত্বপ্রাপ্তি বা দেবায়ন (Apotheosis)। তখনই কি হৃদয় হতে উৎসারিত হয় না আমিত্বের "এই" মহিমা-গীতি একটা ভাবের রসে জারিত হয়ে, মধুমান হয়ে—

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।

তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি গান গেয়ে উঠি
"আছি, আমি আছি।"

এ আকৃতির পিছনে আছে এক ভয়; আতঙ্ক—আমি নাই, আমি নাই, আমি থাকব না। তবে কথা আছে—জিনিষটা যে অতখানি সহজ ও একান্ত, তা নাও হতে পারে। সৃষ্টি একতত্ত্বময় নয়, তা জটিল

১ এ আত্মশ্লাঘা স্মরণ করিয়ে দেয় ফরাসী কবি রঁসার যে মহাবাক্য বলে গিয়েছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে—

Ronsard me célébrait du temps que j'estais belle.
রঁসার আমার স্তুতিগান করেছে সে-কালে যখন ছিলাম আমি সুন্দরী।

শেক্সপীয়রও বলেছেন—

But you shall shine more bright in these contents."
—Sonnets 9

এবং বহুমুখী। 'আমি' অহংকারের কথা বললাম, বললাম তার নেতিমুখী ধারার রহস্য। কিন্তু ইতিপূর্বে একটা পাকা-'আমি'র উল্লেখ করেছি; তার দৃষ্টি দিয়ে দেখলে, তাঁর ভাবে ভাবুক হলে এই আমিত্ব-কীর্তনের অন্যরকম অর্থও ব্যঞ্জনা পাই। বৈষ্ণব কবিদের ভাষণ-ভঙ্গীই মনে পড়ে। দেহজ কামের চিত্র বিবৃত করে চলেছি, কিন্তু তার আন্তর চিত্র ভাগবত প্রেমের লীলা-বৈচিত্র্য। ফলতঃ অজ্ঞানের বাহ্যবৃত্তি যত, তারা যে একান্ত বাহ্য, একান্তই মিথ্যা মোহ তা নয়—সে-সবই হল অন্তরের উত্তরের সত্যেরই ছায়া বা বিকৃতি। বাহিরে যে বিকৃতি দেখি তা অন্তরের প্রকৃতির অনুকরণ। সুতরাং বাহ্যতঃ যাকে বলি অহংকার, অহম্মন্যতা, অহমিকা, অস্মিতা, স্বার্থ-পরতা, স্বাধিকারমত্ততা তার পিছনে রয়েছে একটা দিব্য সত্য, তা হল জীবভূত ব্রহ্মসত্তা, ব্যষ্টিত্ব, ব্যষ্টির অন্তরাত্মা, আমির মধ্যে নিহিত যে তুমি, কিম্বা তুমির মধ্যে প্রস্ফুটিত যে আমি।

অহং যে দাবী করে ভগবানকে, মানুষ যে আকাজ্ক্ষা করে কল্পনা করে—অর্থাৎ ভালবাসে মানুষীভাবেই—ভগবানকে, তার পিছনে রয়েছে এই সত্য যে ভগবানও চায় মানুষকে, শিবও চায় জীবকে, ব্রহ্মও চায় অহংকে। কারণ ও-দুটি বস্তু মূলতঃ একই। মানুষ উপরে উঠতে চায়, কারণ উপরে থেকে নীচে ডাক এসেছে। সৃষ্টি ক্রমে বিকশিত করে চলেছে সেই বস্তু যা তার মধ্যে সম্পুটিত। আমি চাই তুমি হয়ে উঠতে কারণ তুমিই 'আমি'তে লীন বা একীভূত। তাই কবির—

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া

একটা নিবিড় সত্য অর্থ গ্রহণ করে। তবুও যে উপলব্ধি এই সিদ্ধান্তকে সত্য করে তোলে তার স্থিতি আর-এক লোকে বা চেতনায়—তাকে যদি এই লোকের চেতনা দিয়ে ব্যক্ত করি তবে তার সুর অন্য রকম হয়ে পড়েই, তার মধ্যে দেখা দেয় এই মায়ার মিথ্যার লোকের আকৃতি—যে বলে

তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি গান গেয়ে উঠি
"আছি, আমি আছি"

সোঽহমস্মি—সত্য বটে কিন্তু তা হল 'সঃ অহম্,' তা 'অয়ম্ অহম্' নয়—'সঃ' এর মধ্যে ডুবে যাওয়া 'অহম্'—কবি নিজেই ত বলেছেন এক সময়ে—

ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মত যেন
অঙ্গ ওঠে ভরে।

অনেক সময় এ ভাষা শাঁখের করাত যেন। এক দিকে বা এক ভাবে—বাহ্যতঃ যা মনে হয় যেন অহমিকার মাহাত্ম্যনির্ঘোষ; আর-এক ভাবে—আন্তর-অভিজ্ঞতা ও অভীপ্সার দিক দিয়ে তাই আবার আত্মবিলুপ্তি নয় কিন্তু আত্মপ্রাপ্তির ফলে আত্মপ্রকাশের পরিচয়। তা ধরা যাবে ধ্বনির ব্যঞ্জনায়, কণ্ঠের সুরে।

রবীন্দ্রনাথের একপদী কবিতা

পদ বলতে আমি বুঝেছি পংক্তি বা লাইন—একটি মাত্র লাইনের কবিতায় ধরা দেয় যে সৌন্দর্যের নির্যাস, যে তিলোত্তমা কাব্যশ্রী আমি তার উল্লেখ করছি। বিলাতের একটি পত্রিকায় একবার পাঠকদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছিল ইংরাজী কবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ বারটি পদ বা পংক্তি নির্বাচনের জন্য। ফলে অধিকমতানুসারে যে বারটি পদ নির্বাচিত হয়েছিল তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত এই ক'টি আমার মনে রয়ে গিয়েছে—

১। Poor soul, the centre of my sinful earth.
—Shakespeare, *Sonnets*

২। Bare ruinèd choirs where late the sweet birds sang.—Ditto

৩। Fallen Cherub, to be week is miserable
—Milton

৪। And hear old Triton blow his wreathèd horn.
—Wordsworth

আমাদের অভিলাষ রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগৎ থেকে এই ধরণের একপদী রত্ন—বারটিই সংগ্রহ করব। এ জাতীয় পদ রবীন্দ্রনাথে অনেকই আছে যা বহু প্রসিদ্ধিলাভ করেছে, লোকমুখে চলিত হয়ে গিয়েছে পরিচিত প্রবচনের মত। কতবার কত জায়গায় যে তা

বলা হয়েছে, শোনা হয়েছে, উদ্ধৃত করা হয়েছে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি তার ইয়ত্তা নাই—

১। মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
২। বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়
৩। সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর
৪। রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি
৫। আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে
৬। হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে
৭। ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে

ইত্যাদি—

এ সবই এবং আরো অনেক পদ আছে যা তাদের সহজ সৌন্দর্যে আমাদের স্মৃতিকে ভরপুর করে রাখে, কথার শ্রী, ছন্দের দোল, অর্থের ব্যঞ্জনা গড়ে তোলে একটা অবিস্মরণীয় মধুরিমা।

একপদীর বৈশিষ্ট্য তবে আমরা এখানে একটু বিবৃত করতে পারি। প্রথমতঃ পদটি হওয়া দরকার পূর্ণবাক্য, অর্থ হিসাবে ও গঠন হিসাবে—পূর্ণভাবে ও চিন্তায় পূর্ণবাক্য—আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তা বাক্যাংশ হবে না, অন্য বাক্য বা পদের অপেক্ষা রাখবে না। দ্বিতীয়তঃ তাকে হতে হবে সংহত, দৃঢ়, সকল রকম বাহুল্য-বর্জিত। অনাবশ্যক, অপ্রাসঙ্গিক, 'চ বৈ তু হি' অর্থাৎ ফাঁক ভর্তির চাতুরী কিছু থাকবে না। থাকবে অনিবার্য, অপরিহার্য, বেশীও কিছু নয়, কমও কিছু নয়—সব যথাযথ। তৃতীয়তঃ তাতে থাকবে এমন একটা বস্তু, ভাব বা ভঙ্গী, যার জন্য তুমি প্রস্তুত ছিলে না,

অপেক্ষা কর নি—একটা অভূতপূর্ব আকস্মিকতা চমৎকারিতা, যার অন্য অর্থ হল জাদু বা ইন্দ্রজাল, অবশ্য এ জিনিষটি সকল শ্রেষ্ঠ কবিত্বেরই নিজস্ব পরিচয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ বিশেষত্বের উল্লেখ করতে হয়—যা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং বহুল পরিমাণে আলোচিত হয়েছে। তা হ'ল এই যে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বে রয়েছে স্থিতির চেয়ে অধিকমাত্রায় গতির ধর্ম। একটা শান্তি স্থিতি তিনি পেয়েছেন বটে, কিন্তু তা হ'ল গতির যতি হিসাবে, ছন্দের অঙ্গ হিসাবে অথবা একটা সর্বশেষ পরিণতি হিসাবে—যেমন বলেছেন তিনি—

যেন আমার গানের শেষে থামতে পারি সমে এসে।

তিনি যে নির্ঝরের চিত্র দিয়ে তাঁর কাব্য-যাত্রা প্রায় শুরু করেছেন তাই তাঁর কাব্যশ্রীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। চলমান প্রবাহের মধ্যে স্থির মুহূর্ত তাই আমাদের ধরতে হবে তাঁর একপদী সুষমার জন্য। তাই দেখি একপদীর মধ্যে যে স্থাণুত্ব, ভাস্কর্যের মধ্যে যে অচল, নিষ্কম্প, দৃঢ়, জমাট-প্রায় কঠিন ও কঠোর শ্রী প্রায় স্বাভাবিক তার পরিবর্তে এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথে ধরা দিয়েছে একটা দোল, চলিষ্ণুতা—যেন,

সাগরতীরে রোদ পড়েছে ঢেউ দিয়েছে জলে।

রবীন্দ্রনাথকে সুষ্ঠুভাবে, যথেষ্টভাবে উপভোগ করতে হলে তাঁকে একটু তান বিস্তার করতে, আলাপ খেলিয়ে তুলতে দিতে হয়। যখন তিনি বলছেন—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা

তখন ভাবে ও অর্থে বাক্যটি পরিপূর্ণ, তবুও গোটা আলেখ্যটি ধরা দেয় না যদি না বলে চলি—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধানকাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী, ক্ষুরধারা খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা॥

তাই শুধু বললে চলে না—

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী

বাক্য হিসাবে যদিও তা সম্পূর্ণ ও অনবদ্যশ্রী। সমস্ত স্তবকটিই উদ্ধৃত করতে হয় তবে তো কণ্ঠ অমৃতে ভরে ওঠে—

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।
উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।

অবশ্য এ ধারায় বিপদ আছে—আতিশয্য, অতিমাত্রা, প্রগল্‌ভতা,

বাগবৈখরী, তারল্য ও বিক্ষিপ্ততা এসে যায় ঝোঁকের বশে এবং সে গতিকে সংহত রাখা কবির পক্ষে সব সময় সহজসাধ্য নয়। তবুও একপদীর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, স্বল্পতর বিস্তারের মধ্যে আমাদের কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তারও দু-একটি নমুনা দেওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। এই যেমন—

চঞ্চল স্রোতের নীচে
পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের যে মায়া

স্বল্পতর পরিধির মধ্যে কবিকে বাধ্য হয়ে যেন সংহত, জমাট হয়ে—একজন পাশ্চাত্য সমালোচকের ভাষায়, high voltage কবিত্ব হয়ে—দেখা দিয়েছে। এই যথা—

ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, তারে দিনু উৎসারিয়া
এ বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে—

কিম্বা—

হৃদয় তোমার
কোন্ দূর কালক্ষেত্রে চলে গেছে একা
আপনার ধূলিলিপ্ত পদচিহ্ন রেখা
পদে পদে চিনে চিনে…

এ ধরণের হীরার টুকরা রবীন্দ্রনাথে অনেকই মিলবে। এ ছাড়া

আর এক পর্যায়ের স্বল্পপদী কাব্যাংশ—বহুপদী ও একপদীর মাঝখানে—আমরা উল্লেখ করব তাব বিশিষ্ট রসাস্বাদের জন্য। দ্বিপদী কবিতা সকল ভাষার মধ্যেই বেশী প্রচলিত, এই আকারেই যেন কবিতার আদি রূপ—আমরা বলি যা 'দোহা' ইংরেজরা বলে couplet, সংস্কৃতে বলে শ্লোক—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান

এই প্যাটার্নে রচিত (যদিও অধিকতর voltage বা বৈদ্যুতচাপে ভবে দিয়ে) অতি পরিচিত—

শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা,
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা?

কিম্বা পরিণত বয়সের এই পরিণত অনুভব প্রায় একই কাঠামোতে—

সুদূব সম্মুখে সিন্ধু নিঃশব্দ রজনী
তাবি তীর হতে আমি আপনারি শুনি পদধ্বনি।

অথবা—

সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়
এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়।

এই রকম দ্বিপদীর রূপভেদ এবং বিভিন্ন কাঠামোর দ্বিপদী দুচারটি উল্লেখ করলে কবির বৈচিত্র্য কিছু উপভোগ করতে পারি। এই যেমন—

আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিঃস্পন্দ
তারাদীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে।

রবীন্দ্রনাথের একপদী কবিতা

কিম্বা—

চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী—
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।

অথবা—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই—

আরো—

যাহি সবে উপেক্ষায় অপমানে না হয় অস্থির
আঘাতে না টলে।

অথবা সেই অতিপরিচিত—

হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছো ঘর
আমারে দিয়েছো শুধু পথ।

সব গুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অন্তর আস্পৃহা একটা মন্ত্রের মধ্যে ফুটে উঠতে চেয়েছে। এই মন্ত্রের কথা মনে রেখেই আমি বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। এখন তবে একটি বাক্যের মধ্যে যার কাব্যমন্ত্র ধরা দিয়েছে তার বারটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করব আমার বক্তব্য—

১। নূতন প্রভাতে জাগো তমিস্রার পারে
২। অশ্রুত সানাই বাজে অনিশ্চিত প্রত্যাশার সুরে
৩। চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশ স্বপ্নেতে বোঝাই
৪। তারায় তারায় পথ হারিয়ে যায় শূন্যের পারে
৫। সকল সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীরে ফুরায়

৬। সন্দেহ-আড়ালেতে মুখঢাকা জাগে বিশ্বাস
৭। জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
৮। একবার ফিরে এসো। স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি
৯। অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুঞ্জরি
১০। পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে
১১। শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি
১২। ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি

প্রথম চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কবির অন্তশ্চেতনার বোধ, তাঁর মূল আকৃতির সুর। এই মূল সুরটির একটা রূপও স্পষ্টতর ব্যঞ্জনা দিতে চেয়েছে দ্বিতীয় চতুষ্টয়। তৃতীয় চতুষ্টয়ে উল্লেখ করা হয়েছে পথের বাধা ও বিঘ্নের কথা এবং তার উত্তরণ এবং আশা-আশ্বাসের কথা।

কিন্তু দেখছি দ্বাদশটি সূত্র দিয়ে শেষ করা গেল না, একটা কি বাকী রয়ে গেল। একটা চতুষ্টয় দিতে হলো—যার মধ্যে আমার মতে কবির কাব্যশ্রী পেয়েছে তার পরমোৎকর্ষ, নিছক কবিত্ব হিসাবে, কেবল তত্ত্ব বা সত্য হিসাবে নয়—তিনি যে সৌন্দর্যের সার রূপায়িত করেছেন, স্বর্গের পটে ধরে দিয়েছেন যে স্বর্গীয় রূপ, বৈদিক ঋষি একেই কবিত্বের নিদর্শন বলে নির্দেশ করেছেন,—সে চতুষ্টয়—

১। তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা
২। জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা
৩। পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
৪। তোমার হোমাগ্নি-মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি।

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ

"আমাদের যে লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথেরও তাই, তবে সে লক্ষ্যে পৌঁছাবার তাঁর হল নিজস্ব পথ।" এই কথাগুলি শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন প্রায় ত্রিশ বছর আগে ; আর এর মর্ম বোঝা যাবে যখন দেখতে পাব এই দুই বিরাট পুরুষ অন্তরের ধর্মে ও জীবনের অর্থ নির্ণয়ে একই গোত্রের। এ ছাড়া উভয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক মিল রয়েছে—দুজনেই কবি, একটা গভীরতর অর্থে দুজনেই দ্রষ্টা কবি—রবীন্দ্রনাথ প্রভাতের কবি, আর শ্রীঅরবিন্দ কবি ও নবী শাশ্বত দিবসের, মানুষের জন্য এক নূতন উষা ও নূতন দিনের।

দুজনেই দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের জন্মভূমির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তাই উভয়েই চেয়েছিলেন প্রথমে আসল প্রয়োজন হিসাবে দেশের স্বাধীনতা—এই স্বাধীনতার পথেই হবে তার মহত্ত্বের পুনরুদ্ধার। রবীন্দ্রনাথের প্রাণমাতানো গান ও ভাষণ এবং শ্রীঅরবিন্দের অগ্নিময়ী বাণী স্বদেশী যুগে দেশের মনোলোকে রাতারাতি যে কী দারুণ বিপ্লব এনে দিয়েছিল তা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসাবে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীঅরবিন্দ দেশের পুরোভাগে, তাঁর সে দৃপ্ত মহিমান্বিত রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উঠেছিল

রবীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী উপলক্ষে অল-ইণ্ডিয়া রেডিও'র জন্য লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ।

যে অভিনন্দন তা দেশবাসীর অন্তরে আজও অনুরণিত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে, তাঁকে শুনিয়েছিলেন অন্তরের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি :

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী-মূর্তি তুমি !

শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক বহির্জীবন ছাড়লেন যাতে তিনি আর-এক বৃহত্তর জিনিষে একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন— এটির আভাস তখনই তিনি পেয়েছিলেন। এ হল আধ্যাত্মিক শক্তি ও চেতনা—একমাত্র যে-জিনিষ মানুষকে বাঁচাতে পারে, দিতে পারে নবজীবন। ১৯১০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত নির্জনে তিনি এই মহাশক্তির সাধনা করে চলেছিলেন। ১৯১৪ থেকে মাসিক 'আর্য' পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর সিদ্ধির পরিচয় তিনি প্রকাশ করতে লাগলেন। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে পাঁচটি ক্রমশ ধারায় তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান মানুষ কি রকমে পৃথিবীর উপর এগিয়ে চলেছে দিব্য-জীবনের অভিমুখে, এগিয়ে চলেছে বিশ্বমানবের ঐক্যের দিকে, একটা নিখুঁত নির্দোষ সমাজব্যবস্থার দিকে। একটি বিশ্লেষণশাখার শিরোনামা ছিল "ভবিষ্যতের কাব্য" (Future Poetry)—এখানে তিনি বিশ্বের কাব্যসমুদ্র আলোচনা করে তুলে ধরলেন তার ক্রমস্ফূর্ত ক্রমস্ফুট ছবি, কোন্ পরিবর্তন ও পরিক্রমার পথে সে চলেছে, তার পরে উত্তীর্ণ হবে নবযুগের কোন্ প্রভাতী মন্ত্রে, কোন্ অধ্যাত্ম-চেতনার অনাস্বাদিত অপরূপ ছন্দে। যাঁরা দূর দিগন্তের এই নূতন

সূর্যোদয়ের আলো দেখতে পেয়েছেন, শুনতে পেয়েছেন তাঁর চরণ-ধ্বনি, শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের নাম দিয়েছেন অগ্রদূত—নবচেতনার দিশারী—এবং এ দলে তিনি উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথের নাম; কারণ রবীন্দ্রনাথে তিনি দেখেছিলেন নূতনের প্রথম আভাস, "মানুষের জীবনধারায় এক মহত্তর যুগ, সম্ভাবনাপূর্ণ এক বস্তু" ("A glint of the greater era of man's living, something that seems to be in promise"). শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "রবীন্দ্রকাব্যের দ্রুত ও আকস্মিক সাফল্যের মূলে নিহিত রহস্যটি হল তাঁর মধ্যে এই নূতনত্ব—যে জিনিষটির জন্য আধুনিক মন অনুসন্ধানে রত সমসাময়িক অন্য সকলের চেয়ে তাকে তিনিই বেশী প্রকাশ করে প্রসার করে দিতে পেরেছেন। তাঁর কাব্যে বর্তমানের এপারের সীমা অতিক্রমণের ক্লান্তিহীন অশেষ সংগীত, মন্ত্রধ্বনিমুখর দৈবলোক উদ্ভাসিত—সেখানে আত্মলোকের সত্য তার সূক্ষ্ম ধ্বনি ও আলো নিয়ে জীবনের কমসুন্দর ধারাগুলি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।"

'দুঃখাভিসার'-এর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, "এই কবিতার তীব্র মধুরত্ব, প্রাণের আবেগ এবং আধ্যাত্মিক গভীরতা ও রহস্যময়তা, আঙ্গিকের নয় কিন্তু অন্তরাত্মার সূক্ষ্মতা দিয়ে গড়া একটা সম্মোহনীকর সূক্ষ্ম ছন্দধ্বনি, ভাবের সুমধুর প্রকাশ—এগুলিই আসল রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এবং এর অনুকরণ অসম্ভব, কারণ এসবই অন্তরাত্মার গুণ, আর এগুলির কোনো একটি ধরতে হলে আগে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করতে হবে অন্তরাত্মার অনুরূপ গভীরতা ও মধুরতা।" "রবীন্দ্র-প্রতিভার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল কেমন অক্লেশে এবং নিজস্ব ভাবে তিনি

সমস্ত বৈষ্ণব কাব্য আত্মস্থ করে নিয়েছেন এবং তাকে মূলত অভিন্ন রেখে আবার দিয়েছেন নূতন ও আধুনিক রূপ। পুরাতনের মধুর প্রেমধর্মকে তিনি দিলেন আরো সমৃদ্ধ ও ললিত এক ভাষা—তাতে অনুভবের যে অন্তরগামী ও আধ্যাত্মিক দোলা আদিকালের সরল অথচ হৃদয়বান কবি ফুটিয়ে ধরতে পারেন নি, তা-ও বাঁধা পড়ল।"

উভয়ের জীবনে কয়েকটি যোগাযোগও লক্ষ্য করবার মতো। ১৯০৫ এবং তার অব্যবহিত পরবর্তী কয়েক বছরে ভারতের প্রথম জাতীয় জাগরণ যখন তার চরমে উঠেছিল তখন এই দুই মহাপুরুষ একত্র হয়েছিলেন। উভয়েই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দকে গুরুত্বপূর্ণ বলেছিলেন—নানা স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে মহাযুদ্ধ এক। রবীন্দ্রনাথের কাছে এর অর্থ 'যুগসন্ধি'—শতবর্ষবৃদ্ধ রাত্রির অবসানে দুঃখ বেদনা মৃত্যুর তোরণ পার হয়ে প্রভাতের আরক্ত আভায় নূতনের আবির্ভাব। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, মহাযুদ্ধ হল মহাপ্রলয়—প্রকৃতি এই ভাবেই পুরাতনকে চূর্ণ করে নূতনকে স্বাগত করেন। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র জন্মও এই সময়ে—বিশ্বের আড়ালে কী এক মহারহস্যময় দুর্বার শক্তি সবকিছুকে প্রাণবন্ত সচল করে তুলেছে, উন্মুখ করে তুলেছে ঊর্ধ্বের পানে—তারই এক অনুপম চিত্র এখানে। 'আর্য' পত্রিকার পৃষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন যে অতিমানসের অবতরণ তাঁর মধ্যে ও পার্থিব পরিমণ্ডলে শুরু হয়েছে তারই পরিচয়, তারই বহুধা রূপ।

সুতরাং এ তো প্রায় অনিবার্য যে উভয়ের আবার সাক্ষাৎ হবে। শ্রীঅরবিন্দ ইতিমধ্যে একান্তবাস নিয়েছেন—যারা তাঁর পরিচর্যা করেন তাদের ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে দেখা করেন না। বৎসরে মাত্র তিন বার তিনি বের হন ভক্ত ও অনুরাগীদের দর্শন দেবার

জন্যে। সেটা ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি। রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন দক্ষিণ ভারত পর্যটনে। তিনি একখানি পত্রে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে লিখলেন। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য সানন্দে সম্মতি দিলেন। রবীন্দ্রনাথ একখানি ষ্টিমারে পণ্ডিচেরী এসে পৌঁছলেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল জাহাজে গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো, তার পর সঙ্গে করে আশ্রমে নিয়ে আসা। শ্রীঅরবিন্দের ঘরের দরজায় মা তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের কাছে নিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ মাকে আগেই চিনতেন, দেখা হয়েছিল জাপানে। সেখানে প্রায় রোজ তাঁদের আলাপ হত। একবার সাতদিন একসঙ্গে উভয়ে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। কৌতূহলের বিষয় কিন্তু উল্লেখ করি, তিনি মাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর কর্মভার গ্রহণ করতে—তাঁর মনে হয়ে থাকবে এই দুটি নিপুণ হাতে তাঁর আশ্রম থাকবে নিরাপদ। মার পক্ষে রাজী হওয়া সম্ভব ছিল না, তাঁর কর্মক্ষেত্র অন্যত্র নিয়তি-নির্দিষ্ট, তাঁর ব্রত অন্য।

দুই মহাকবির মধ্যে কী কথাবার্তা হল তা আমার বক্তব্য নয়, সাক্ষাৎ একান্তই ব্যক্তিগত। তবে উদ্ধৃত করব রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে নিজেই কী লিখেছেন :

"অনেক দিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখব। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল।... প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সব চেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে : ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন।...মনে হল তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোনো খরদস্তুর মতের

উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা...আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন: যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।...আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে: শৃণ্বন্তু বিশ্বে।

অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়, আজও তাঁকে মনে মনে ব'লে এলুম—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

যুগে যুগে অবতার, বিভূতি, সিদ্ধপুরুষরা এসে মানুষকে পথ দেখিয়ে যান। আমাদের সৌভাগ্য, আমরা ছিলাম এমন এক যুগে যা এই দুই মহাজ্যোতিষ্কের আলোয় আলোকিত।